সৈকত রক্ষিত: অনুরাগে অনুভবে

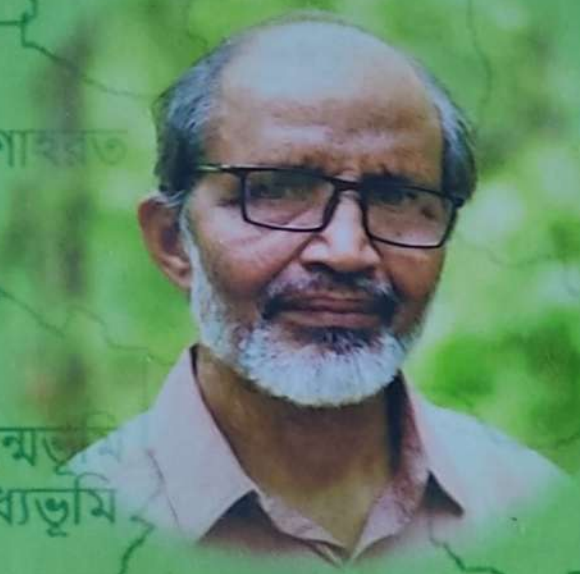

সম্পাদনা

অরূপ পলমল

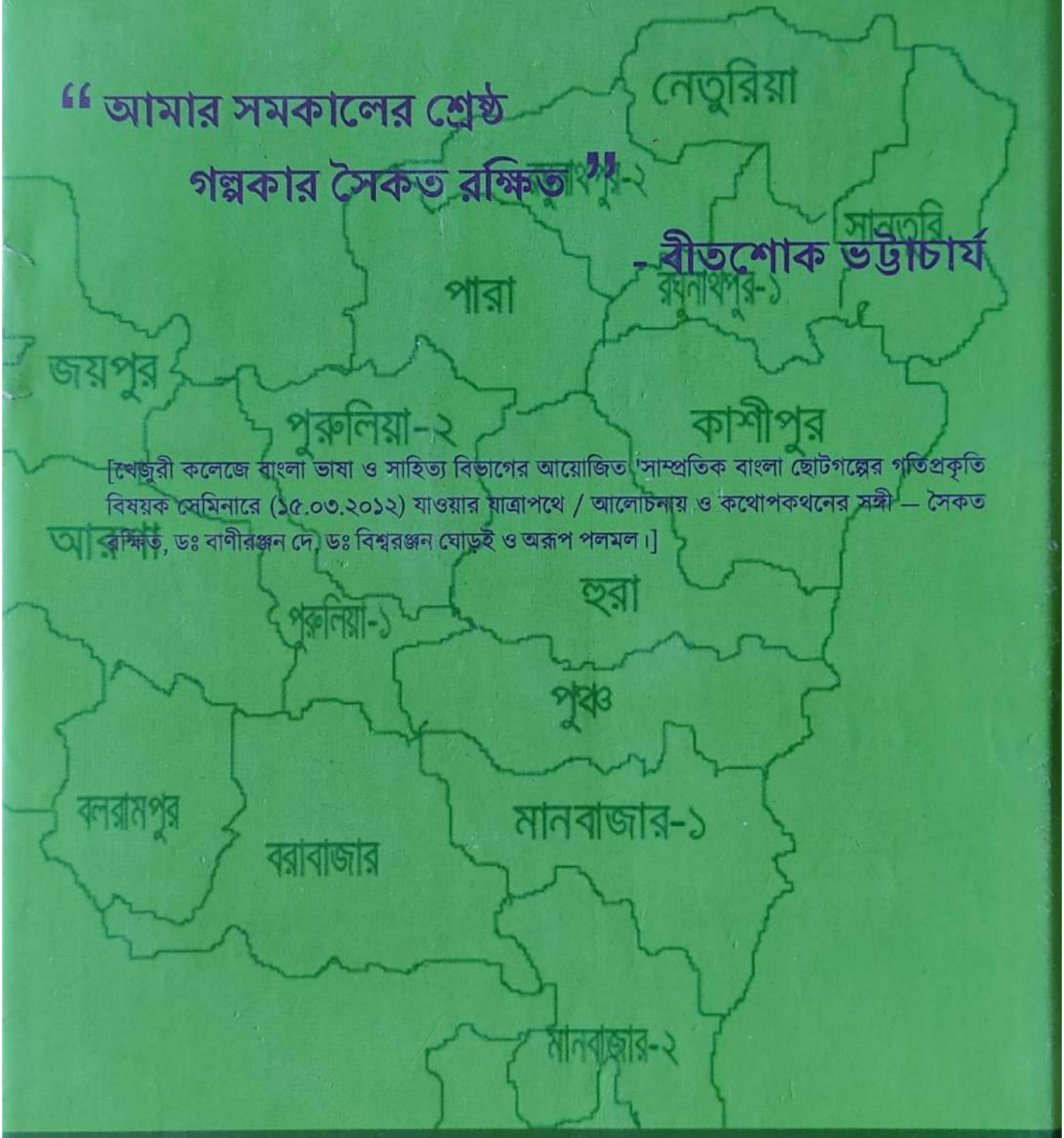

"আমার সমকালের শ্রেষ্ঠ
গল্পকার সৈকত রক্ষিত"

\- বীতশোক ভট্টাচার্য

[খেজুরী কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের আয়োজিত 'সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি বিষয়ক সেমিনারে (১৫.০৩.২০১২) যাওয়ার যাত্রাপথে / আলোচনায় ও কথোপকথনের সঙ্গী — সৈকত রক্ষিত, ডঃ বাণীরঞ্জন দে, ডঃ বিশ্বরঞ্জন ঘোড়ুই ও অরূপ পলমল।]

978-93-93728-11-1

₹ ৭৫০/-

তবুও প্রয়াস? পাবলিকেশন

৯/৪ টেমার লেন, কোলকাতা-৯

SAIKAT RAKSHIT- ONURAGE O ONUBHOBE

A Collection of Essay About Writter Saikat Rakshit live and Creation

Edited by

ARUP PALMAL

Published by Tapati Publication– 9/4 Tamer Lane, Kolkata 700009

প্রথম প্রকাশ :

৮ নভেম্বর, ২০২২

(গুরু পূর্ণিমা/সৃজন উৎসব/সৃজনভূমি, মানবাজার, পুরুলিয়া)

শ্রীমতী পাপিয়া চক্রবর্তী কর্তৃক তপতী পাবলিকেশন, ৯/৪ টেমার লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১ বি, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত

গ্রন্থস্বত্ব : প্রতিরূপ পলমল

প্রচ্ছদ : সুজয় চৌধুরী

গ্রন্থ অলঙ্করণ : সুজয় চৌধুরী

আলোকচিত্র : অরূপ পলমল

বর্ণসংস্থাপন : অরূপ পলমল

প্রকাশিকা ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশের কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনও রকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ISBN : 978-93-93728-11-1

মূল্য : ৭৫০ টাকা মাত্র

আলোচিত গ্রন্থ : প্রসঙ্গ সৈকত রক্ষিত

(তথ্য সংগ্রাহক অরূপ পলমল)

১। লেখা এক অপ্রত্যক্ষ সংগ্রাম; সৈকত রক্ষিত, কেন লিখি?; সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও প্রণব বিশ্বাস সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০১, পৃষ্ঠা; ২৭৮-২৭৯

২। সৈকত রক্ষিত: প্রান্তিক জীবনের আখ্যান; শতাব্দী শেষের গল্প, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০১, পৃষ্ঠা; ১৬২-১৬৮

৩। সামাজিক অন্তরবয়ন; কাল-বিভাজিত বাংলা উপন্যাস, প্রিয়কান্ত নাথ; বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ২০০৭, পৃষ্ঠা; ১১০-১১২

৪। কারিগরের হিসেব-বেহিসেব, রুশতী সেন; বাংলা উপন্যাস সমীক্ষা, সম্পাদনা; বীতশোক ভট্টাচার্য; এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০৮, পৃষ্ঠা; ১৩৭-১৪২

৫। সৈকত রক্ষিতের গল্প; সুমিতা চক্রবর্তী; বাংলা গল্প ও গল্পকার, সম্পাদনা; সুবল সামন্ত; এবং মুশায়েরা, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ২০০৯, পৃষ্ঠা; ১০৪-১১২

৬। গোষ্ঠীসংগঠন ও গোষ্ঠীজীবন; গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৯, ২০০৯, পৃষ্ঠা; ৮৮-৯০

৭। বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় চেতনা: একটি খসড়া, কথার ইশারা; পৃথ্বীশ সাহা, মুদ্রাকর, ১৮ এ রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, ২০১০, পৃষ্ঠা; ৭১-৭৩

৮। সৈকত রক্ষিত; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ ১৯৫০-২০০০), দেবেশ কুমার আচার্য্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা-৯, ২০১০, পৃষ্ঠা; ১২১৩-১২১৬

৯। সৈকত রক্ষিত; পরিবর্তমান গ্রামসমাজ: গল্পকারদের ভাবনা (১৯৭৭-২০০৭), সংকলন; শ্রাবণী পাল, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিডন রো, কলকাতা-৬, ২০১১, পৃষ্ঠা; ৬২-৭২

১০। সৈকত রক্ষিতের গল্প 'আঁকশি': 'আপকি কাহানি তো মুঝে বিলকুল রুলা দিয়া'; প্রতিমা দাস; বাংলা ছোটগল্পে একালের সংলাপ, সম্পাদক; গৌতম দণ্ডপাট, খেজুরী কলেজ, বারাতলা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০১৩, পৃষ্ঠা; ১৬৫-১৭৩

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

১। সৈকত রক্ষিত : গল্পকার-ঔপন্যাসিক-কবি- পদকর্তা- নাট্যকার- প্রাবন্ধিক। সৃজন উৎসবের মূল কর্ণধার। সাহিত্যের সব সময়ের কর্মী।

২। গোষ্ঠ বর্মণ : গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বরাবাজার বিক্রম টুডু মেমোরিয়াল কলেজ, পুরুলিয়া।

৩। সুখেন মণ্ডল : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৪। শ্যামল রায়: গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ।

৫। পৃথ্বীশ সাহা : সাহিত্য সমালোচক, অনুবাদক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। 'মুক্তাক্ষর' পত্রিকা সম্পাদক ও অমি প্রেস,কর্ণধার। সুভাষ গ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা।

৬। নাড়ুগোপাল দে : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

৭। বিশ্বজিৎ পাণ্ডা : প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক, সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়, গোতান, বর্ধমান।

৮। দিলীপ কুমার বসু : কবি- নাট্য গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য, রাজধানী কলেজ, নিউদিল্লি, দিল্লি।

৯। প্রিয়কান্ত নাথ : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, আসাম।

১০। শ্রাবণী সিংহ রায় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, তমলুক মহাবিদ্যালয়, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।

১১। গাফফার আনসারী : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আড়ষা কলেজ। গবেষক, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

১২। অনিমেষ ব্যানার্জী: শিক্ষক ও গবেষক, সিধু-কানু-বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া।

১৩। সুমিত পতি : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৪। শ্যামল মোহন্ত: গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ।

১৫। রামকুমার মুখোপাধ্যায় : বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক। দুই দশকের অধিক যুক্ত ছিলেন পূর্ব ভারতের সাহিত্য অকাদেমির।

১৬। বিপ্লব গঙ্গোপাধ্যায় : কবি, কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

১৭। কৌশিক মিত্র : বিশিষ্ট সাহিত্য অনুরাগী ও প্রাবন্ধিক।

১৮। চিন্ময় সাধুখাঁ : গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯। প্রবুদ্ধ মিত্র : বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও ছোটগল্পকার।

২০। অচিন্ত্য মাজী : কবি ও গবেষক, শিক্ষক, তেঁতুলহিটি উচ্চবিদ্যালয়, ঠাকুরডি, পুরুলিয়া।

২১। সুনীল মাজি : শিক্ষক, কবি ও প্রাবন্ধিক। খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর। পশ্চিমবঙ্গ।

২২। আজমিরা খাতুন : অতিথি অধ্যাপক, আল- আমীন মেমোরিয়াল মাইনরিটি কলেজ, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

২৩। সদানন্দ অধিকারী : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। ভারতবর্ষ।

২৪। শিবশঙ্কর সিং : লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বলরামপুর কলেজ, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

২৫। অরূপ পলমল : অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সরকারী মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লপুর-দুই, ঝাড়গ্রাম।

২৬। সুজয় দত্ত : সাংবাদিক ও শিক্ষক। গড় জয়পুর, পুরুলিয়া।

২৭। আফসার আমেদ : বিশিষ্ট গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। বাগনান, হাওড়া।

২৮। প্রবীর সরকার : অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, নিস্তারিণী কলেজ, পুরুলিয়া।

২৯। অনিতা অগ্নিহোত্রী : কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক, মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

৩০। প্রতিমা দাস : গায়িকা, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষিকা, উচাহার হাইস্কুল, কেশপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

৩১। অমরেশ দাস : গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ। ভারতবর্ষ।

৩২। নাজমা ইয়াসমিন : শিক্ষক ও গবেষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

৩৩। অপূর্ব পাহাড় : সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, দমদম মতিঝিল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, গবেষক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

৩৪। ক্ষীরোদচন্দ্র মাহাতো : লোকসংস্কৃতির গবেষক ও অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কাশিপুর কলেজ, কাশিপুর, পুরুলিয়া।

৩৫। গোপা বিশ্বাস : সহকারী অধ্যাপক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

৩৬। সুমিতা চক্রবর্তী : ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।

৩৭। শ্রাবণী পাল : বিশিষ্ট সমালোচক এবং প্রাবন্ধিক ও অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,

সৈকত রক্ষিত: ও-পাড়ার প্রাঙ্গণের রূপকার

গোপা বিশ্বাস

চেনা পরিসরের বাইরে ছড়িয়ে থাকা অপরিচিত বিস্ময়কর জীবনের উপলব্ধি সৈকতে রক্ষিতের কথাসাহিত্যের মূল ভিত্তি। নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে বহু দূরে প্রকৃতির কোলে পুষ্ট তথাকথিত শ্রেণিবিভাজনে আদিবাসী নামে অবহেলিত মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই মানবিক সংবেদনে এক অন্যরকম অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। ছোটোগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আকস্মিক চমকের অভিঘাত আলোচ্য গল্পদুটির মূল বৈশিষ্ট্য নয় বরং একমুখীন সরলরেখায় চিরকালীন শাশ্বত অনুভবই বাঙ্ময় হয়ে গল্পগুলিকে নতুনত্ব প্রদান করেছে। গঠনগত নিজস্বতায় গল্পের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট ধারণার বাইরের নতুন ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে। অচেনা ভৌগোলিক পরিবেশে অজানা মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই নিশ্চিন্ততার ঘেরাটোপে থাকা পাঠককেও বিষাদগ্রস্ত করে তোলে। সাধ ও সাধ্যের, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির আসমান-জমিন তফাৎ থাকা সত্ত্বেও প্রাণপ্রাচুর্যের উৎস স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় ইতিবাচকভাবে উঠে এসেছে। না পাওয়ার অন্তিম বিন্দুতে অবস্থান সত্ত্বেও গল্পের চরিত্ররা তাই জীবনের সামান্য আয়োজনকেই চেটেপুটে আস্বাদন করেছে। তাই হতাশা, গ্লানি, ক্ষোভ-বঞ্চনার মাঝেও জীবনের বৃত্ত নির্দিষ্ট পরিক্রমায় আবর্তিত হয়ে বিন্দু বিন্দু ভালোলাগার মুহূর্ত তৈরি করেছে। রাতের ঘন অন্ধকারে আকাশের বুক চিরে ওঠা ক্ষণস্থায়ী আলোর রোশনাইয়ের মতোই তার আয়ু। তবুও বেঁচে থাকার আনন্দকে এইভাবেই ছড়িয়ে দিয়ে এই প্রান্তিক মানুষেরা নিজের উত্তরাধিকারকে অর্পণ করেছে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে। তাই বঞ্চনার মাঝে নিত্য বাস করেও ইতিবাচক ভাবধারায় জীবন এগিয়ে যায় নির্দিষ্ট ছন্দে।

'ঝাঁকশি' ও 'পাখা' গল্প দুটির মূল পটভূমিকায় রয়েছে এইরকমই প্রান্তিক মানুষদের জীবন পরিক্রমার কথা, হতদরিদ্র পরিবারের বারোমাস্যার এক ঝলক প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাদের একটি দিনের লড়াইয়ের ঘটনায়। 'ঝাঁকশি' গল্পের মাধারাম বা 'পাখা'র শামাউন প্রতিকূলতার মধ্যেও জীবনের রঙকে নানাভাবে উপভোগ করেছে। দারিদ্র্যতার সঙ্গে মিশে আছে অসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা—যা নীরবে অভিযোজন করায় সমাজের শ্রেণিবিভাজনের অসাম্যকে। উচ্চবিত্ত বা অর্থবানের পাশে নিজেকে মেলে ধরতে না পারার যন্ত্রণা লাঘব হয়ে যায় না পাওয়ার কষ্টকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়ায়। যেটা পাইনি তার জন্য আফশোষ বা হতাশা নয় বরং সংকুচিত অভিমান সবার অলক্ষ্যে দু-ফোঁটা চোখের জল বের করে নিয়ে আসে যা তার

একেবারেই নিজস্ব। সমাজের চিরকালীন নিয়মকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতাকে বুকের মধ্যে লালন না করেও অভিমানী হৃদয় সামান্য আয়োজনকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়।

'আঁকশি' ও 'পাখা' গল্পের মধ্যে লেখক খুঁজে দিয়েছেন এমনই দুই জীবনের কাহিনি। অখ্যাত জীবনের বেঁচে থাকার লড়াইকে কুর্নিশ জানানোর মধ্যে দিয়ে কাহিনির সূচনা ও সমাপ্তি। বৃত্তাকারে আবর্তিত জীবনের প্রাত্যহিক রোজনামচায় ঘুরে ফিরে আসে সুখ দুঃখের স্বাভাবিক পালাবদলের নৈর্ব্যক্তিক রূপ, বিষাদের কুয়াশায় জড়িয়ে থাকা জীবনেও আশার সূর্য ঝিলিক দিয়ে ওঠে, সম্পূর্ণ হয় জীবনের অয়ন।

'আঁকশি' ও 'পাখা' গল্পদুটির গঠনবিন্যাস ও রচনাকৌশলে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট বয়ান। দুটি গল্পেরই ঘটনার সময়সীমা একটি দিন। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত এই বারো ঘণ্টার মধ্যে জীবননাট্যের এক শাশ্বত সমাপতন দুটি চরিত্রের সম্পূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। 'আঁকশি' গল্পে মাগারাম শিমুল গাছের সন্ধানে আঁকশি কাঁধে পুরো পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। শিমুলের ফল থেকে তুলো বের করে সে বাজারে মহাজনের কাছে বিক্রি করে, আর সেই বিক্রিত অর্থই তার জীবনধারণের প্রধান উৎস। তাই জঙ্গলের মাঝে চেনা পরিসর ছাড়িয়ে নতুন নতুন জায়গায় গাছচুক্তির সন্ধান করে সে। সঙ্গে থাকে স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান। অনিশ্চয়তাকে সঙ্গী করে পথচলার ফাঁকে জীবনের আনন্দকে সাগ্রহে বরণ করে নেয়। অকুণ্ঠিত চিত্তে যৎকিঞ্চিৎ ভাললাগাকে গ্রহণ করেই পথচলার ক্লান্তিকে দূরে সরিয়ে রাখে তারা। এমনকি ছোট নীলকমলও বাবা-মায়ের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে অভ্যস্ত হতে থাকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের ধারাকে বহমান রাখতে।

আশা নিরাশার দোলাচলে আবর্তিত নিত্যকার জীবন থেমে থাকে না। মাগারাম দিনের শেষ বেলায় খুঁজে পায় তার প্রার্থিত শিমুল ফলের গাছ। সন্ধানী সজাগ হিসেবি মনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে তার কারবারি মাগারাম। ধনী স্বচ্ছল গরাইয়ের পাশে নিজের সামাজিক অবস্থানকে প্রকটভাবে অনুধাবন করতে পেরেও কোথাও আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চায়। মাগারাম জানে তার গাছ চুক্তির সামান্য অর্থ না পেলেও স্বচ্ছল গরাইয়ের অর্থনৈতিক কোনো সমস্যাই হবে না। সে একবার নিজের দারিদ্র্য, অক্ষমতা, অদৃষ্টকে স্মরণ করে বলতেও চায় - 'বাবু! হামরা ভখার জাত। মুচি। হামদের দশটা টাকায় কী কাম দিবেক আপনার?' কিন্তু উপবাসী দারিদ্র্যপীড়িত, নিচু জাতি হলেও আত্মমর্যাদাবোধ তাকে টেনে ধরে। নিজেকে ছোটো করে অর্থ বানানোর চিন্তা সে মাথা থেকে দূর করে দেয়। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দরদাম করে গাছ চুক্তি করে ফেলে। সসম্মানে নিয়োজিত হয় নিজের কাজে। তার নাম নিয়ে গরাইয়ের সস্তা রসিকতা বা গরাইয়ের বাড়ির ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া একটি ভাতের ফ্যান পিচুটি বসা খোলা চোখেও বাঁচার ইচ্ছাকে দ্বিগুণ করে তোলে। গাছের মগডালে দীর্ঘকায় হাড়গিলে মাগারামের লটকে থেকে আঁকশি বাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে অপ্রতিরোধ্য জীবনীশক্তি যেমন প্রকাশ পায় তেমনি গরাইয়ের বাড়িতে ফলন্ত পেঁপে গাছের পেঁপে দেখে আঁকশি দিয়ে পেড়ে ফেলার উদগ্র ইচ্ছাকে লাগাম পরাতে গিয়ে অবচেতন স্তরে মাগারাম লোভী হয়ে ওঠে। আঁকশি এখানে শোষক ও শোষিতের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। আঁকশি ঘাড়ে নিয়ে দিনের পর দিন তার নাগালের বাইরে চলে যাওয়া জিনিসকে করায়ত্ত করতে গিয়ে নিজের আয়ত্তের বাইরের দ্রব্যকে গ্রহণ করার নেশা তাকে পেয়ে বসে। আর এই নেশায় বুঁদ হয়ে অজানা পথের রহস্য উদঘাটনে দীর্ঘ পথ পরিক্রমার ক্লান্তি তার দূর হয়ে যায়। জীবনযুদ্ধের সওয়ারি হয়ে বেঁচে থাকার সাধনায় আঁকশি তার প্রধান হাতিয়ার যাকে কেন্দ্র করেই এক বিষম জীবনযুদ্ধে লড়াই করার সাহস সে অর্জন করতে পারে।

বেঁচে থাকার অপর নামই তো জীবন যুদ্ধ। সমাজের বর্ণবিন্যাস, জটিল ও বিচিত্র মানুষের মনের

অলিগলি যার হদিশ ব্যক্তির নিজেরই অজানা, সেই পথে জন্ম থেকে মৃত্যুর পথ পরিক্রমায় নানা ঘটনার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার রাশিই তো জীবনের প্রধান মূলধন। সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সরণি বেয়ে ক্ষণিক সুখ বা দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের অনুভব জীবনকে দার্শনিক উপলব্ধি দান করে।

'পাঘা'র শামাউন আনসারির জীবনের পথ পরিক্রমায় অপ্রাপ্তির শূন্য ভান্ডার হৃদয়ের গভীরে বড় বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। নিজেকে নিয়ে ভাবনা ও আসলে নিজেকে বঞ্চিত করারই অন্য রূপ। শরীরের কষ্টকে গুরুত্ব না দিয়ে স্বরচিত সংসারের দায়িত্ব পালনে নিরুপায় শামাউনকে তাই উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যেতে হয়। বিরাট পৃথিবীর একটি ছোট্ট কোণে সাওয়া তিন বিঘা জমির ফসলে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে চাওয়ার মধ্যেই প্রতিদিনের বাঁচার লড়াই চলতে থাকে। সামর্থ্যের মধ্যে ভালো থাকতে চাওয়ার আকাঙ্খাও তাই মাঝে মাঝেই মুখ থুবড়ে পড়ে। পরিবারের ভার বহনের প্রধান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জীবনের সত্যিটা জানে সে - 'নিজেকে নিয়ে এই চার-চারটা পেট ভরসা করে আছে তার একার কামাইয়ের উপর। রুজি রোজগারের ধান্দায় শেষদিন তক তাকে পসিনা ছুটিয়ে যেতে হবে।' এক নিদারুণ সহ্যশক্তির পরীক্ষা দিতে দিতে ক্লান্ত শামাউন যখন কিছুটা ধাতস্থ হয়ে যায় তখনই ভাগ্যের আকস্মিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায় সে। হালের গোরু জঙ্গলের বিষাক্ত লতাপাতা খেয়ে মুখে ফেনা তুলে যখন মারা পড়ে তখন সে খোদাতাল্লার নামে কপাল চাপড়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু বসে পড়লে খোদাতাল্লা তার মরা গোরু ফিরিয়ে দেবে? বিপর্যয়ের সত্যিটা যেমন সে জানে তেমনি কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকতে হবে এ অভিজ্ঞতাও তার দীর্ঘ জীবনের উপলব্ধ সত্য। এই অজানা যুদ্ধে নিজের ক্ষমতাটুকুই তার প্রধান ভরসা। 'কোন অদৃশ্য শক্তির প্রতি আস্থা প্রতিদিনের' জীবনসংগ্রামের তীব্রতায় 'দিন কে দিন অস্পষ্ট ও যুক্তিহীন হয়ে যায়'।

অতএব ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শুরু হয়ে যায়। যা চলে গেছে তার কষ্ট দূর করে নতুন করে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে হয়। নিতান্ত অনিচ্ছায় দুধ দেওয়া গরু বাছুর সহ বিক্রির কথা ভাবতে হয়। ভোরবেলায় বালক আবুদনকে নিয়ে গরুকে পাঘা পরিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঝালদার হাটে নিয়ে যাবে সে। পিতা পুত্র অভুক্ত অবস্থায় হাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বালক আবুদন হাটের মজা দেখবার আশায় বিভোর হয়ে পা চালায় বাপের সঙ্গে। আর অসহায় বাপ শামাউন তার ঘরের পালপোষ করে বড়ো করা গাই বাছুর বিক্রি করে পয়সা রোজগারের আশায় হেঁটে চলে দীর্ঘ পথ। বয়সের ভারে কিছুটা কাহিল তবুও পদব্রজে মাইলের পর মাইল ক্লান্তিহীন পথ চলতে থাকে গরুর পাঘা বাঁধা প্রান্তভাগ ধরে। অনভ্যস্ত বিক্রেতা শামাউন হাটের ভিড়ের মাঝে কিছুটা যেন হতচকিত হয়ে যায়। আর তার হাতে ধরা গাই গরুও অচেনা পরিবেশের হই হট্টগোলে হাটের ভিতরে প্রবেশ করতে চায় না। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিতান্ত বাধ্য হয়ে হাটে আসা সামাউন গাই বিক্রি করতে না চাইলেও অবস্থার ফেরে গরজ দেখাতে বাধ্য হয় সে। হাটের মাঝে অচেনা লোকের গায়ে পড়া বিদ্রুপের হাসি, সঙ্গে তীর্যক উক্তি 'গাই সে বিক্রি করতে না চাইলে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাক'- শামাউনকে অভিমানী করে তোলে। বড়ো সস্তা তার অভিমান, সে জানে কেউ নেই তার মনের দুঃখকে উপলব্ধি করার জন্য। আর সে নিজে! নিজের অভিমান নিজের কাছে গুরুত্ব দিয়ে বসবার সময়ও কি তার আছে? তবু একরাশ বিষণ্ণতায় মন তার ভরে ওঠে -'ঘরে পালপোষ করা গাই, কান ফটফট করা তার চনফনে সুন্দর ধলা বাছুর আর আবুদনের শুকনো মুখ দেখে সেই অভিমান মুহূর্তে তীব্র হয়ে ওঠে। মনে হয় খদ্দার বড় অবুঝ। বড় স্বার্থপর তারা।'

এই 'অবুঝ' আর 'স্বার্থপর'- এর ভিড়ে অসহায় বিপন্ন শামাউনকে বোঝার মানুষ নেই। শামাউন নিজেও জানে তার দারিদ্র্যতার স্বরূপ। উপলব্ধি করে অসহায় মানুষের ডুবে যাওয়ার আগে খড়কুটো আঁকড়ে ধরার

আকৃতি। নিজের অবস্থানকে নিজেই বিচার করে হাটের ভিড়ে মিশে যেতে চায় ছেলে আবুদনকে নিয়ে। কিন্তু হাটের মাঝে নিজেকে তার বড়ই বেমানান মনে হয়। চারিদিকের বেচাকেনা হই হট্টগোলের মাঝে নিজেকে গুছিয়ে মেলে ধরতে পারে না সে। মনে হয় বিক্রিত মূল্যের যে ধারণা নিয়ে সে এসেছিল তার পারা ধীরে ধীরে নামতে থাকে। হেমন্তের দিনের শেষভাগের কুয়াশা ঘেরা চলাচরের মতো তার মনের আশার উত্তাপও কমে আসতে থাকে। মেলার হই হট্টগোলের মাঝে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় তার - '... গাই যদি বিকতে না পারে? অল্প সময়ের জন্য হাটের হইহল্লা তার কানে আসে না। শ্রবণশক্তিহীন ফ্যাকাসে আদমির মতো সে হাটের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তার নজর আলতো করে বুলিয়ে নেয়।'

অগণিত মানুষের মধ্যে থেকেও শামাউন ক্রমশ একা হয়ে যেতে থাকে। বর্তমান সমস্যার স্বরূপ ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা তাকে চিন্তিত করে তোলে। নিদারুণ জীবন সংকটে বিপর্যস্ত হতে হতে দিশাহীন লক্ষ্যে যেন তার অমোঘ নিয়তি। নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য নিরূপণ করতে পারার মালিক সে নয় বরং প্রতিনিয়ত না মেলা জীবন অংকের অদৃশ্য সুতোয় ঝুলতে থাকে তার জীবন। স্বপ্ন দেখার সাহস তার মতো দরিদ্র মানুষের নেই। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য সামান্য উপকরণ সংগ্রহে লড়াই চালানোর শক্তি প্রতিনিয়ত তাকে অর্জন করে নিতে হয়। হাটের অগণিত মানুষের ভিড়ে নানা পণ্যসম্ভারে ভরে থাকা প্রাণপ্রাচুর্যতার মাঝে শামাউনের অক্ষমতা ধনী-দরিদ্র্যের চিরকালীন বিভাজনকে যেন প্রকট করে তোলে। দারিদ্র্যের চাপে নুয়ে পড়া শামাউনকে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতির চাপে অপারগ হয়ে হার মানতে হয়। বাইরের পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, অসহায়তার নাগপাশে আবদ্ধ তার অমোঘ নিয়তি তাই সমস্ত অনিবার্য তাকে মেনে নিয়েও অন্তঃকরণে শুরু হয় ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা যার সদর্থক কোনো উত্তর তার জানা নেই। যদি হালচাষের জন্য অন্য গরুকে সে বিক্রিত অর্থে কিনতে না পারে তাহলে তার চাষাবাদের জন্য সে কি করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা সে নিজেকে প্রশ্ন করে -'.... জোয়ালের অন্য পাশে ব্যাটা আবুদনকে জুড়ে সে খেতে লাঙল ঘুরিয়ে যাবে?'

শামাউনের এ প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সামাজিক পদমর্যাদার মানুষের নিম্নমুখী অবস্থানের চিত্র। গরুর পাশে শিশুপুত্রকে জুড়ে দেওয়ার ভাবনার মধ্যে যে নিঃশেষিত অসহায় পরিস্থিতির দিক নির্দেশিত হয়েছে তা আসলে এই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক মানুষদের জীবনের বাস্তব চিত্র। শুধু বেঁচে থাকার জন্য পশুর সঙ্গে সহাবস্থানে বাধ্য হতে হয় যাদের তাদের প্রতিদিনের লড়াইয়ের রোজনামচায় এই নিদারুণ কঠিন বাস্তবের প্রয়োগ খুব অস্বাভাবিক নয়।জীবনকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও নিজের সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুঁজে নিয়ে সহায়সম্বলহীন মানুষ বেছে নেয় রূঢ় বাস্তবকে। জীবনের কঠিন লড়াইয়ের মুহূর্তে তাই হার না মানা মনের জোরই বাঁচিয়ে রাখে তাদের।

প্রতিকূল পরিবেশ আর সমাজের শ্রেণিবৈষম্যের চক্রব্যুহে শামাউন বা মাগারাম কেবলমাত্র দর্শক। তাদের ইচ্ছে অনিচ্ছের সুখ দুঃখের হিসেব কেউ রাখে না, শামাউনের শিশুপুত্র আবুদন বা মাগারামের শিশুপুত্র নীলকমল পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। আবার এই দুটি বালক তাদের পিতার ফেলে আসা শৈশবের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। একদিকে সামাজিক বিভাজনের প্রকট রূপ গল্পদুটির মূল সুর কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে নিয়ে আনন্দে মেতে ওঠার দুর্লভ মুহূর্ত। জীবনের তাত্ত্বিক ভাবনায় উচ্চাঙ্গিক ভাবের অধিকারী তারা নয় কিন্তু প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যকে অনুধাবন করার দুর্লভ দৃষ্টি তাদের আছে। সবুজ প্রকৃতির মাঝে মাইলের পর মাইল নগ্ন পায়ে ঘুরে বেড়ানোর মুহূর্তগুলি নানা আনন্দের সূত্রে তাদের স্মৃতিপথে ধরা থাকে। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মধ্যে বাৎসল্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ জীবনের জটিলতাকে সরল করে দিয়েছে। 'পাঘা'র আবুদন পিতা শামাউনের সঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে খিদে ক্লান্তি ভুলে

প্রকৃতির সৌন্দর্যে হারিয়ে যায়। তার চঞ্চলতায় মিশে থাকে প্রকৃতিকে নতুন করে আবিষ্কারের ইচ্ছা - 'বাপের সঙ্গে কদম মিলিয়ে হাঁটতে পারে না সে। ছুটে এসে সঙ্গ ধরে খ কখনো পলাশের ঝুড়ে সোনাল পোকা ধরতে গিয়ে বাপের থেকেও ঢের ফারাকে পড়ে থাকে সে। ... মুঠো খুলে বাপকে দেখায় কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা কানকটারি সোনাল পোকা কিংবা লুলু পাথরের নুড়ি।' প্রকৃতির কোলে বড়ো হয়ে ওঠা বালক প্রকৃতির মাঝেই খুঁজে পায় তার আনন্দের উপকরণ। জীবনের অনেক চাওয়া পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েও মনের ভান্ডার তার পূর্ণ হয়ে থাকে নানা প্রাণপ্রাচুর্যে। তাই হাসিমুখেই চলে প্রাণের উৎস সন্ধানের আয়োজন। সন্তানের সঙ্গে জনকের আত্মিক টান দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডি অতিক্রম করে এক শাশ্বত সম্পর্কের দিককে তুলে ধরেছে। অভাব, দারিদ্র্যের মধ্যেও পিতৃহৃদয় স্বাভাবিক বাৎসল্যের প্রকাশকে রুদ্ধ হতে দেয়নি। আঁকশি ও পাখা দুটি গল্পেই রুটি রুজির খোঁজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে পিতার স্নেহ পরশ শিশুপুত্রের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। ছোটো ছেলে তার স্বাভাবিক চঞ্চলতায় যখন বাবার পায়ে পা মেলাতে পারেনি তখন পিতা শামাউনের আন্তরিক আহ্বান - 'আবুদন! কথা গেলি বাবু- ... চ বাবু রাগে রাগে চ দেখি।' তাকে নতুন করে উজ্জীবিত করে তুলেছে।

'আঁকশি'-র মাগারামও পুত্র নীলকমলের প্রতি একই স্নেহ বাৎসল্যের প্রকাশ দেখিয়েছে। নাবালক নীলকমল জঙ্গলের পথে শিমুল গাছের সন্ধানে বেরিয়ে মা বেদনি, বাবা মাগারামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে না পেরে পুকুরের পাড়ে কিংবা টিলার পাশে লুকিয়ে থাকে। নিজে স্বাভাবিক চঞ্চলতায় গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে থাকে, বলে- ''হামি নাই যাব। যা ক্যানে তরা। নাই যাব। মাগারাম অনেকটা কালো ও লম্বাটে, রুগ্ন চেহারায় এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে বড়ো সুরেলা গলায় ডাকে তার ব্যাটাকে। বলে 'নীলকমল আয় বেটা-" এ ডাককে উপেক্ষা করতে পারে না নীলকমল। স্নেহ পরশের এই সার্বজনীন ধারা বয়ে যায় অখ্যাত অজ্ঞাত মাগারাম বা শামাউনের না পাওয়া জীবনের মধ্যেও।

এক অখ্যাত জীবনের আখ্যানে সৈকত রক্ষিত অচেনা পরিবেশেও চিরকালীন চেনা ছবিই পরিবেশন করেছেন। তথাকথিত সভ্য মানুষদের থেকে অনেক দূরে সমাজের নির্জন পরিসরে লোকচক্ষুর অনেকটা আড়ালে বহমান জীবন তার নিজের মতন করেই সেজে উঠেছে। প্রকৃতির অন্দরে জীবনের আনন্দের রসদও প্রকৃতিই সাজিয়ে রেখেছে। অচেনা সেই অনুভূতিকে আখ্যানের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বলেই লেখক স্বতন্ত্র। জীবনের আখ্যানে শাশ্বত অনুভবের সহজ প্রকাশ, সঙ্গে বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এই মানুষদের অবস্থান পাঠককে ভাবনার রসদ যুগিয়ে চলেছে। এই ব্যতিক্রমী লেখকের অনুভব আশাবাদী জীবনের বীজকেই রোপণ করে যায়, আগামী দিনে যা প্রাণপ্রাচুর্যে ফলবতী মহীরুহ হয়ে উঠবে।

বাংলা ছোটগল্প পর্যালোচনা

বিশ শতক

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রাবণী পাল সম্পাদিত

ISBN 978-93-83161-45-4

Bangla Chhotogalpa Paryalochana : Bish Shatak (Vol. II)
Edited by Dr. Srabani Pal, Rabindra Bharati University

প্রথম প্রকাশ
মে ২০২৩

প্রকাশক.
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা ৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্টম্যাক্স
ইছাপুর

মুদ্রক
বসু মুদ্রণ, কলকাতা ৪

ISBN 978-93-83161-45-4

৪৫০ টাকা

সূচিপত্র

বাংলা ছোটগল্পের ধারা : বিশ শতক সাত শ্রাবণী পাল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩—১৯৩২)

বঞ্চিত মাতৃত্বের প্রতিচ্ছবি : 'কাশীবাসিনী' ১ সায়ন ব্যানার্জী

দেবী : মাতৃত্বের মুখ ৯ মনামী বসু

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী : জয় রামের গল্প নাকি আদরিণীর? ১২ সুদীপ মণ্ডল

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প : 'ভিখারী সাহেব' —পিতৃত্বের ভিন্নমুখী বিস্তার ২১ সুব্রত দাস

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প : 'বাজিকর' ২৯ সুব্রত দাস

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬—১৯৩৮

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' : বাস্তবতার অন্যরূপ ৩৫ মাধুরী বিশ্বাস

শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' ৪১ বিশ্বজিৎ পান্ডা

মন্দির : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪৮ শিপ্রা দে

শরৎচন্দ্রের 'বিলাসী' : প্রেমের গল্প নাকি সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ ৫৭ সুখেন মণ্ডল

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) (১৮৮০—১৯৬০)

পরশুরাম এবং 'কচি-সংসদ' ও 'উলট পুরাণ' ৬৪ চৈতালী ব্রহ্ম

পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' : রঙ্গব্যঙ্গের দর্পণে ৭৩ বিমলচন্দ্র বণিক

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬—১৯৫৭)

'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' : ব্যতিক্রমী আখ্যান ৯৫ মানিকলাল সাহা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪—১৯৫০)

'মৌরীফুল' : শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০১ শিপ্রা দে

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরচরণ' : অমেয় অভিযাত্রা ১১০ নিবেদিতা চক্রবর্তী (দত্ত)

বিভূতিভূষণের উমারাণী : ঝরা বকুলের কান্না ১১৭ রণবীর নাথ

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪—১৯৮৮)

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'—এক ভাঙা স্বপ্নের উপাখ্যান ১২৬ গোপা বিশ্বাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯—১৯৭১)

বেদেনী : কামনার লেলিহান শিখা ১৩৭ সায়ন ব্যানার্জী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অগ্রদানী' : একটি নিবিড় পাঠ ১৪৪ সোমনাথ মণ্ডল

রিরংসার ভিন্ন মাত্রা : 'নারী ও নাগিনী' ১৫৭ রুচিরা চন্দ

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'—এক ভাঙা স্বপ্নের উপাখ্যান

গোপা বিশ্বাস

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষে এল বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘ শাসনের অবসানে এক নতুন ভোরের সূচনা হল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর শপথবাক্য উচ্চারিত হল— "Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge... ."[১]

স্বাধীন ভারতের নতুন প্রভাতে শপথ নেওয়ার এই আনন্দঘন পরিবেশ কিন্তু সমগ্র ভারতবাসীর কাছে শুভ ফল প্রদান করল না। সমুদ্র মন্থনের ফলে অমৃত কলসের সঙ্গে বিষকুম্ভ উঠে আসার মতোই দেশভাগের গভীর ক্ষত স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দকে হতাশায় রূপান্তরিত করেছিল। ইতিহাসের এই তথ্য সাহিত্যের পাতায় রক্তমাংসের সজীবতায় প্রাণ পেয়েছে, বিশেষত সমকালীন লেখকদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিককে গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে। ছিন্নমূল মানুষের জীবন যন্ত্রণা, তাদের কঠিন জীবন সংগ্রাম, বেঁচে থাকার লড়াই প্রখর বাস্তবতায় উঠে এসেছে 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছোটোগল্প ও উপন্যাসে। সব হারানো নিঃস্ব মানুষগুলোর জীবন্ত মৃত হয়ে যাওয়ার কাহিনি এই গল্পে ইতিহাসের সত্যকে নতুন অবয়ব দান করেছে।

লেখিকার কলমে দেশভাগ সমকালীন বাস্তব জীবন তার স্বরূপ নিয়ে সাহিত্যের পাতায় ধরা পড়েছে। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রান্তের রাজনৈতিক ঘটনার ওঠানামা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই বাংলাদেশের বাইরের ঘটনাও তাঁর লেখায় সহজেই জায়গা করে নিয়েছে। সংবেদনশীল ও সহানুভূতির আলোয় মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে অনুভব করার প্রচেষ্টা তাঁর কথাসাহিত্যকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। কাহিনির মধ্যে বাস্তবতার ছোঁয়ায় তাই চরিত্রগুলিও রক্তমাংসের সজীবতায় মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বিশেষত 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছোটোগল্পে ছিন্নমূল মানুষের জীবনসংগ্রামের ভয়াবহতা ও তার করুণ পরিণতিকেই স্মরণ করায়।

১৮৯৪ সালে সুদূর রাজস্থানে জয়পুরে জন্ম নিয়েছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। উনিশ শতকের একেবারে শেষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করেও অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের অলিন্দের বাইরে খুব বেশি পা রাখার সুযোগ তাঁর হয়নি। বিশ শতকের প্রথমভাগে শৈশব থেকে কিশোরী হয়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে মাত্র দশ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি স্বামীগৃহে যান। পনেরো বছরের সংসার জীবনের স্বল্প সময়ে ছয়টি সন্তানের মা হয়ে পরিপূর্ণ গৃহিণী হয়ে ওঠার সময়ই স্বামী মারা যায় এবং সন্তানদের নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। অকাল বৈধব্যের যন্ত্রণা ও সেইসঙ্গে মনোজগতের এক বিরাট শূন্যতা তার লেখক সত্তাকে জাগিয়ে তোলে। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে সরে থাকার ও শূন্য

মনের অবলম্বন হয়ে ওঠে বইপড়া ও লেখার অভ্যাস। মনের গভীরে নানা অনুভবের টানাপোড়েন ও কাছ থেকে দেখা অন্তঃপুরের মেয়েদের জীবন সমস্যা এই সবই তাঁর কাহিনির অন্যতম বিষয় হয়ে ওঠে। ছোটো থেকে বাড়িতে সামান্য পড়াশোনার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ সমাপ্ত হতেই সংসারজীবনে প্রবেশ ও অন্তঃপুরের চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁর সমগ্র অস্তিত্ব আবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই যখন তাঁর সুরক্ষিত ঘেরাটোপ ভেঙে পড়ল তখনই তিনি নিজের অন্তরের শূন্যতা উপলব্ধি করতে পারলেন। জীবনের প্রয়োজনেই বিকল্প দরজা খুলতে হয়েছিল তাঁকে, ভালো থাকার প্রচেষ্টায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন সাহিত্যের পাঠে। ধীরে ধীরে নিয়োজিত হয়ে গেলেন সৃষ্টির কাজে। ১৩২৮ সালের আষাঢ় মাসের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'নারীর কথা' প্রকাশিত হল। রক্ষণশীল ঘরের গৃহবধূ হয়েও কলম হাতে প্রবেশ করলেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে— পিছনে ফেলে আসলেন স্বামীর সাহচর্যে কাটানো এক পূর্ণ গৃহিণীর জীবন। বৈধব্যের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় শুদ্ধ অন্তঃপুরবাসিনীর মন কিন্তু আধুনিকতার সীমানাকে ছুঁতে পেরেছিল, তাই নিজের সন্তানদের ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে দেখেননি। উভয়দেরই সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন, আর এই সাম্য দৃষ্টিই মেয়েদের হয়ে কথা বলতে সাহস জুগিয়েছিল। প্রতিবাদী ও স্পষ্টভাষায় বহু ছোটোগল্প রচনা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। শৈশবে রাজস্থান, তারপর হুগলি জেলার গ্রাম, পরে স্বামীর সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল পাটনা ও পরে দিল্লিতে বসবাসের সূত্রে তিনি নারীর চিরন্তন সমস্যা নিয়ে নানাদিক থেকে ভাবার রসদ পেয়েছেন। দেশের মধ্যেই ভিন্ন সংস্কৃতির আবহে অন্তঃপুরের মেয়েদের অভিন্ন সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করে সহানুভূতির সঙ্গে তাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাস ও ছোটোগল্প কষ্টকল্পিত কাহিনি হয়ে ওঠেনি, সমকালীন জীবন সংস্কৃতি তাঁর লেখার অন্যতম বিষয় যা তাঁকে বহুল জনপ্রিয়তা দিয়েছিল। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ বন্ধু হয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবীকে পরিচিত করিয়েছিলেন 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি কবিতা ও 'নারীর কথা' নামে প্রবন্ধের মাধ্যমে। এরপর তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বেরোতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ কবিরূপেই। প্রথম জীবনে প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন তিনি। পরে গল্প ও উপন্যাস। প্রথমদিকে 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন তিনি।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহজ সরল ভাষা। কিন্তু এই ভাষার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক সুদৃঢ় ভঙ্গি। অকারণ জটিলতায় লেখার মূল বিষয়টি কখনোই হারিয়ে যায়নি। প্রথাগত ডিগ্রিধারী না হয়েও মানুষের মনোজগতের হদিশ পেয়েছেন খুব সহজেই। বিভিন্ন মনীষীদের জীবন-বাণী বিশেষত স্বামী বিবেকানন্দের বাণীসমূহ যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন। নিজের দেখা জীবন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষায় বাস্তবের প্রেক্ষাপটকে তিনি নান্দনিকতার সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। ফলে তাঁর লেখা পড়ে

পাঠক একটি নির্দিষ্ট সময়ের দেশকালকে অনুধাবন করতে সমর্থ হয়। তাঁর লেখার সময়টা বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থেকেছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের বাংলা তথা ভারতে তখন ঘটনার ঘনঘটা। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সমস্ত ভারতবর্ষে তখন চূড়ান্ত অস্থিরতা, সেই প্রেক্ষাপট তিনি তাঁর লেখায় ব্যবহার করেছেন। সবথেকে বড়ো কথা বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাঁর সাহিত্যে জায়গা করে নিয়েছে। স্বাধীনতা, দেশভাগ প্রসঙ্গ তাঁর লেখা উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-তে এসেছে বাংলা সীমান্ত ও পাঞ্জাব সীমান্ত দুইদিকের সত্য ঘটনাকে সামনে রেখে। বাংলাদেশের মতো পাঞ্জাবের মানুষও যে দেশভাগের বলি সেটা বাংলা সাহিত্যে তাঁর লেখাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। এভাবে বহির্বাংলা বিশেষত রাজস্থানের মানুষের জীবন ও সমাজচিত্র, মেয়েদের অবস্থান সবই তাঁর লেখায় জায়গা করে নিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের সীমানা ভারতীয় হয়ে উঠেছে তার লেখনীর মাধ্যমে যা সেই যুগে বাংলা সাহিত্যে বিরল একটি ঘটনা। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হল— 'চক্রবাল কবিতাগুচ্ছ', 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮), 'মনের অগোচরে' উপন্যাস (১৯৫২), 'আরাবল্লীর কাহিনী' ছোটোগল্প (১৯৬৫), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাস (১৯৬৮), 'সোনারূপা নয়' ছোটোগল্প (১৯৬৯), 'ছায়াপথ', 'রাজযোটক', 'আরাবল্লীর আড়ালে' প্রভৃতি। দেশভাগ আর তার বিষময় ফল, নানা ঘটনার মধ্যে জীবনের ভাঙনের টুকরো টুকরো ঘটনা নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীতে নানা কোলাজ সাহিত্যের পাতায় তৈরি হয়েছে তারই একটি নিদর্শন জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ছোটোগল্পটি। কাহিনির মধ্যে লেখিকার অনুভব ও জীবনদর্শন শিল্পিত সংযমের মাধ্যমে সংহত রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

একটি সুন্দর সাধ আহ্লাদে পূর্ণ জীবনের আকস্মিক বিপর্যয়, যার কেন্দ্রে রয়েছে দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব সেই বিষয়টিকে নিয়েই কাহিনির প্রেক্ষাপট গড়ে উঠেছে। গল্প তো কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে উড়তে চায় অনেক সময়। সেই কল্পনার মাঝে কখনও কখনও জড়িয়ে থাকে কঠোর নির্মম এক বাস্তবতা যা দেশকাল সমাজের এক বিশ্বস্ত দলিল হয়ে ওঠে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পটির মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের বিষময় পরিণতিরই একটি ঝলক তুলে ধরেছেন।

পরিচিত বাসস্থান ও মায়ার বাঁধনে ঘেরা জন্মভূমি ছেড়ে অজানা অচেনা দেশে পাড়ি দিতে হবে দুর্গা, সুদামকে। একটি সুখী দম্পতি একে অপরের সুখ দুঃখের সাথী— পথে নেমেছে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যাবে মান, সম্মান ও ইজ্জত বাঁচাতে। বিধর্মী দেশে জান, প্রাণ বা সম্মান কোনোটারই ভরসা নেই। অগত্যা পথে নামা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে এক দলভুক্ত হয়ে মনের শক্তিকে বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা, ভরসা একটাই, সবাই একই সম্প্রদায়ভুক্ত। সবারই একই গন্তব্য। পথের রসদ সামান্যই। ঘর গেরস্থালির

হাজারো প্রয়োজনীয় জিনিস ফেলে আসতে হয়েছে তাদের। সামান্য কিছু সামগ্রী আর একরাশ যন্ত্রণাই তাদের চলার সম্পদ। নিম্ন মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া সওয়ারি হয়ে আসা নয়, পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে দুর্গা-সুদামের মতো অসহায় মানুষেরা। অবশেষে অদৃশ্য রেলগাড়ির উপস্থিতি 'তীক্ষ্ণ বাঁশির কু' শব্দ শোনা গেল। তারপর আকাশে কালো ধোঁয়া মনের মধ্যে আনন্দের বান ডাকে পথে নামা মানুষগুলোর। মেয়েরা উলুধ্বনি দিয়ে মনের হর্ষ প্রকাশ করে ফেলে। কয়েকজন পুরুষ হরিবোল ধ্বনি দেয়। তাদের এই আনন্দের উচ্ছ্বাস থামিয়ে দেয় এক প্রবীণ মানুষ। সাবধান করে দেয় বিধর্মী শত্রুদের দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে। পথের শেষভাগটুকু ভালোভাবে পার হয়ে অজানা দেশের নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পাড়ি দিতে চায় সবাই।

দুটি দেশ— মাঝখানে কাঁটাতারের বেড়া, সীমান্তে কত নজরদারি, আইন অনুযায়ী পাসপোর্ট ও আরো কতকিছুর আয়োজন। আর সামনের এই নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুধু পয়সার বিনিময়ে মানুষ পার হয়ে যাচ্ছে। যারা দিতে পারছে তারা দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর যারা নিতান্ত অপারগ তাদের হেনস্থা হতে হচ্ছে। নাকাল হয়ে মাথা কুটতে হচ্ছে। এই অপারগ হয়ে থাকার দলে রয়েছে সুদাম ও তার স্ত্রী দুর্গা। পথের সাক্ষীরা যে যার মতন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যারা টাকা পয়সা দিতে পারল তারা দুই দেশের রক্ষীদের মন জুগিয়ে চলে যেতে পারল আর যাদের সেই অবস্থা নেই তারা অসহায়ভাবে "স্টেশনের প্রান্তে এক পাশে বসে থাকে।"

দেশের ক্রান্তিকাল— স্বাধীনতা এসেছে অথচ পূর্ববঙ্গের মানুষেরা জীবনকে বাজি রেখে জীবন বাঁচাতে চাইছে। ধর্মরক্ষা, সম্মানরক্ষায় ভরসা কেবল অদৃশ্য এক ইচ্ছাশক্তি যার ভরসায় নিজেদের অসহায় ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করেছে তারা। আর এই বিপর্যয় আরো বড়ো আকার ধারণ করেছে সুবিধাভোগী কিছু লোভী মানুষের দল, সীমান্ত পাহারায় অদৃশ্য টাকার লেনদেন করে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ছলে। কিন্তু যারা এদের লোভের অনলে পর্যাপ্ত ঘি ঢালতে পারবে না তারা যেন ধীরে ধীরে হরিয়ে যাবে এই শক্তিমানদের ভিড় থেকে। ঠিক যেন ডারউইনের সেই যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন তত্ত্বের মতো টিকে থাকার লড়াইতে শক্তি না থাকলে একসময়ে অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে এ পৃথিবীর বুক থেকে। সুদাম ঋষি জাতে মুচি, সাথে তার সুন্দরী স্ত্রী দুর্গা। দেশভাগের কবলে পড়ে দেশ পারাপারের জন্য সীমান্তে আসলেও পার হওয়ার অনুমতি মেলে না। লোভী মানুষদের নজর পড়ে দুর্গার সুন্দর দেহপটের উপর। মুহূর্তে আদিম রিপুর তাড়নায় দুর্গাকে কুক্ষিগত করতে চায় তারা। সুদামের পাঁচটি টাকার বেশি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অতএব তাদের আটকে থাকতে হবে সীমান্তর রেলস্টেশনে। দুর্গার দেহমধু পান করার উদগ্র ইচ্ছায় সুদামকে পঁচিশ টাকায় সীমান্ত পারের কথা বলে। মুহূর্তে বুঝে নেয় সুদামের অক্ষমতা। সমস্যার সমাধানে মরীয়া সুদাম কলকাতায় দুর্গার দাদার বাড়িতে যাওয়ার

কথা ভাবে, লোভী মানুষেরা উল্লসিত হয়ে ওঠে সুদামকে ভিনদেশে পাঠিয়ে দুর্গাকে একা করে দেওয়ার পরিকল্পনায়। স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে যদিও দুর্গার থাকার ব্যবস্থা হয় তবুও সেটা তাদের মনে আশার সঞ্চার করে— সুদাম ফিরে না এলে সুন্দর শিকার তাদের হাতের মুঠোয়।

এ যেন শিকারকে পাওয়ার জন্য টোপ ফেলে অপেক্ষা করা। স্টেশন মাস্টারের বাড়ির নিরাপত্তা সাময়িক, আর সুদাম অপরিচিত দেশে গিয়ে ফিরে আসতে না পারলে একদিন এই মেয়েটি তাদের সামগ্রী হয়ে যাবে। স্টেশন মাস্টার কয়েকদিনের জন্য সুদামের স্ত্রীকে রাখতে সম্মত হলে বড়ো নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুদাম। পয়সা নিয়ে ফিরে এসে সে নিয়ে যাবে দুর্গাকে। দুর্গা আর সুদাম বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। দুজনেই একরাশ চিন্তা আর এক চিলতে আশার আলোতে যেন জীবনকে বাজি রাখল। দুর্গা সুন্দরী অল্পবয়সি যুবতী— অপরিচিত ভিন্ন ধর্মের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কেবল দিন গুনতে থাকে। তিনদিনের কথা বলে গেলেও সাত দিন এমনকি দশ দিনেও ফিরে আসে না সুদাম। প্রতিটি প্রহর অতিবাহিত হয়. উৎকণ্ঠায়। বাইরে লোভী মানুষেরা ওঁৎ পেতে আছে শুধু দুর্গার বাইরে পা দেওয়ার অপেক্ষায়।

"... স্টেশনের ফাজিল ছোঁড়াগুলো বিবিসাহেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। নানা গল্পের মাঝে বলে "বিবিসাহেব ওকে কেন ঘরে পুষে রেখেছ। বিদেয় করে দাও। যেখানে ইচ্ছে যাক চলে।"[২]

দুর্গা স্তম্ভিত হয়ে আতঙ্কে কাঠ হয়ে যায়। যে দুরবস্থা ও অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসা সেই ভয়ংকর পরিণতিই যেন গিলে খেতে আসে তাকে। স্টেশনের কুলিদের কদর্য মন্তব্য কানে আসে দুর্গার— সুদাম যে টাকা নিয়ে আর ফিরবে না সেটাই তারা বিশ্বাস করাতে চায় দুর্গা ও আশ্রয়দাতাকে। দুর্গার আত্মবিশ্বাস তলানিতে এসে ঠেকে যখন সে শুনতে পায়—

"... সে আবার আসবে টাকা নিয়ে। ঘাড় থেকে নামিয়ে বেঁচেছে বলে। এবার ছুঁড়িই কত টাকা রোজগার করবে। আমরাই খদ্দের দেখে দেবো।"[৩]

নিজের উৎকণ্ঠার পাশাপাশি বাইরের লাগাতার আক্রমণ দুর্গার আত্মবিশ্বাসকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। যদিও আশ্রয়দাত্রী স্টেশন মাস্টারের বিবি তাকে আশ্বস্ত করেছিল, বাইরের কথায় কান দিতেও বারণ করেছিল কিন্তু ভিতরে ভিতরে তারা স্বামী-স্ত্রী যে আশ্রিত দুর্গাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল সেটা দুর্গা তাদের টুকরো টুকরো আলাপচারিতা থেকে বুঝতে পারছিল। তার স্বামী সুদাম ফিরে আসবে কিনা এই ভাবনার সাথে জড়িয়ে থাকে দুর্গার ভবিষ্যৎ জীবন। স্টেশন মাস্টার যদিও তার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলে— "... আসবে। জোয়ান পরিবার, অত রূপ তার সাথে আশঙ্কাও থাকে হয়তো কোনো বিপদে পড়েছে বা টাকার জোগাড় হয়নি।" আশঙ্কার মেঘ ঘনীভূত

হয় তার বিবির উক্তিতে— "আহা জোয়ান মেয়েটা। কি হবে কে জানে। সে যদি না আসে, কতদিন তুমি রাখতে পারবা এই হাঙ্গামা হুজ্জুতের দিনে।"[৪]

বিনিদ্র দুর্গা ভাবে স্বামী না ফিরলে সে কী করবে। ছেড়ে আসা গ্রামে, রাস্তায় মেয়েদের দেহ নিয়ে পৈশাচিক উল্লাসের ভয়াবহ রূপ তো সে দেখেছে। যে আতঙ্কে তারা নিজেদের বাসভূমি ছেড়েছে সেই ভয়ংকর পরিণতিই কি তার ভবিতব্য! সুদামের জন্য অপেক্ষা করার শক্তি ধীরে ধীরে যেন কমে যেতে থাকে দুর্গার। পরিস্থিতি যেন প্রতিকূল হতে থাকে। স্টেশন মাস্টার ও তার স্ত্রী ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে থাকে সুদামের ফিরে আসা নিয়ে। রান্নাবান্না বন্ধ করে দেয় দুর্গা, ক্রমে খাওয়া দাওয়াও। শেষ পর্যন্ত ২১দিন বাদে ফিরে আসে সুদাম টাকা পয়সা সমেত। অনেক কষ্টে ২৫টি টাকা সে সংগ্রহ করে আনতে পেরেছে, দুর্গাকে নিয়ে সেইদিনই সে চলে যাবে বলে। কিন্তু যার জন্য তার এত পরিশ্রম সে তার অপেক্ষায় আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারেনি। পচা পুকুরে গলায় ইট বেঁধে নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেতে ডুবে মরেছে। সুদামকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে স্টেশন মাস্টার ও তার বিবি। তারা যখন দুর্গার ভয়াবহ পরিণতির কথা বলে তখন সুদাম মানতে পারে না দুর্গার অন্তিম পরিণতিকে। যার হাত ধরে ঘর ছেড়েছিল তাকেও সে ধরে রাখতে পারল না। মনের মধ্যে দুর্গার সুগভীর অস্তিত্ব নিয়ে সুদাম বাইরেও ক্রমাগত তাকেই খুঁজে বেড়ায়। অচেনা দেশে অচেনা মানুষের মাঝে চেনা একটি মুখের অন্বেষণে দিনগুলি শেষ হয়ে যায়। নতুন দিনের শুরুতে নতুন করে শুরু হয় তার প্রিয় মানুষের অন্বেষণ পর্ব। দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব কাহিনির মধ্যে সমকালকে সজীব বাস্তবতায় ধরে রেখেছে। দুর্গার মৃত্যুকাহিনির অন্তিম মোড় এনে ছোটোগল্পে আকস্মিকতা ও সম্পূর্ণতা সাধন করেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিষাদাত্মক করুণ এক পরিণতি গল্পের উপসংহারে ট্র্যাজেডির রূপকে ফুটিয়ে তুলে পাঠককে নিয়ে গেছে সেই দেশকালের পটভূমিকায়। দুর্গা তো আসলে অসংখ্য অসহায় ঘর ছাড়া মেয়েদের প্রতিনিধি মাত্র। পরিবার পরিজন, সম্মান সবকিছুই যখন ক্রান্তিকালে বিক্রয় হয়ে যায় তখন অসংখ্য দুর্গা এভাবেই অকালে নিজেদের নিঃশেষ করে দিতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিক অসাম্য, লোভী মানুষের পৈশাচিক লোভ, রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতা ও ব্যক্তিস্বার্থ ঘরের দেওয়াল ভেঙে দিয়ে মানুষকে পথে নামিয়ে নিয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সম্মান, আব্রু, স্বস্তি, গৃহশান্তি সবকিছুই ধ্বসে যায়। থেকে যায় সব হারানো বেঁচে মরে থাকা মানুষগুলোর দীর্ঘনিঃশ্বাস। সুদাম তো বেঁচে থেকেও আসলে মারা গেছে, তার দেহটাকে সে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। দুর্গাকে হারিয়ে সুদাম তো জীবন্ত এক মৃত মানুষেই রূপান্তরিত হয়।

একটি বিয়োগান্তক পরিণতি গল্পের মূল বিষয়কে ইতিহাসের এক নিদারুণ ঘটনার সাক্ষ্যকে বহন করছে। কল্পনার দুর্গা তো আসলে নিদারুণ বাস্তবেরই প্রতীক। দুর্গা নামের

সাথে দুর্গতিনাশিনীর সংযোগ থাকলেও এই কাহিনিতে সে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়া অসহায় এক নারী, যে জীবন শৃঙ্খলে আটকা পড়ে হারিয়ে গেছে।

মূলত দুটি চরিত্র সুদাম ও দুর্গাকে নিয়ে মূল কাহিনি গড়ে উঠলেও এখানে সমকালীন সময় ও পরিবেশই সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ক্রান্তিকালীন পরিবেশে মানুষ পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা হয়ে গেছে এখানে সেই অগ্নিগর্ভ প্রতিকূল সময়কে তুলে ধরার জন্য লেখিকা দুটি চরিত্রকে মাধ্যম করেছেন। সুদাম ও দুর্গা প্রতিকূলতাকে জয় করে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু পথে নেমে পথের শেষ পর্যন্ত তারা একসাথে হাঁটতে পারল না। অনিচ্ছাকৃত এই বিচ্ছেদের দায়ভার কিন্তু তাদের নয়। খুব বেশি আয়োজন বা আড়ম্বর তারা চায়নি, কেবল দুজনে ভালোবেসে একে অপরের সঙ্গে নতুন করে বাঁচার একটা ঠিকানা তৈরি করতে চেয়েছিল। কিন্তু পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাদের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে দিল না। সুদামের সমস্ত প্রচেষ্টাই এক নিমেষে অর্থহীন হয়ে গেল।

সুদামের এই শূন্য জীবনের দায়ভার আসলে দেশের নীতি নির্ধারণকারীদের, যাদের ক্ষমতালিপ্সা ও ভ্রান্ত নীতির পরিণতি হল এই দেশভাগ। সুতপা ভট্টাচার্যের লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই কথা—

> দেশভাগের সমস্যা শুধু বাংলারই নয়, পাঞ্জাবের বহু মানুষকেই পিতৃপুরুষের মাটি ছেড়ে নিরাপত্তা ছেড়ে সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামতে হয়েছে। ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে হয়েছে। দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে সমগ্র পরিবার কিন্তু তারো মধ্যে মেয়েদের সমস্যা কঠিনতর এইজন্য যে তারা যৌনসামগ্রী, লুণ্ঠনের উপযুক্ত। সর্বনাশেরও এক মেয়েলি মাত্রা আছে।[৫]

আর মেয়েদের যৌনসামগ্রীতে পরিণত হওয়ার সুস্পষ্ট তথ্য রয়েছে জ্যোতিময়ী দেবীর অন্য আরেকটি গল্প 'সেই ছেলেটা'-র মধ্যে। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' দুর্গা যৌনসামগ্রী হতে না চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল আর 'সেই ছেলেটা' গল্পে বাংলা থেকে বহু দূরে পাঞ্জাবের হিন্দু পরিবারেও একই ভয়ংকর নির্মম পরিণতির ছবি এঁকেছেন লেখিকা। দাঙ্গার রাতে লাহোর থেকে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সবাই পুলিশের গাড়িতে উঠতে পারলেও বাড়ি থেকে সময়মতো বেরিয়ে আসতে পারেনি রাজকুমারীর মা। তাকে খোঁজার সুযোগ আর কেউ দেয়নি। সীমান্তে বহু খোঁজাখুঁজি ও প্রতীক্ষার পরও আর তার দেখা পাওয়া যায়নি। বহুদিন পর রাজকুমারী দিল্লির রাস্তায় এক ভিখারিণীকে দেখতে পায় একটি ছোটো ছেলের হাত ধরা অবস্থায়। মা হিসেবে তাকে যখন সে চিনতে পারে তার আগেই সেই নারী সেখান থেকে চলে যায়। পরে রাজ হিসেব মিলাতে গিয়ে মায়ের হাতে ধরা ছোটো ছেলেটির পরিচয় বুঝতে চেষ্টা করে। অবশেষে জটিল সমস্যার সমাধান হয়। দাঙ্গার পরিণতিতে তার মা যে যৌন লালসার শিকার

হয়েছিল এ সন্তান তারই ফলশ্রুতি। ফলে রাজ তার মাকে চিনে নিলেও ছেলেটি যে তার ভাই নয়, সেটায় কোনো সন্দেহ থাকে না।

মেয়েদের এই যন্ত্রণার দিক ছাড়াও আরো নানাদিক থেকে দেশভাগ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। সমকালীন আরো কয়েকজন লেখকের কলমে উঠে এসেছে সেই বিপর্যয়ের দিক। অচেনা পথে অসুস্থ সন্তান যাদবকে নিয়ে পরাশর ও তার স্ত্রী মোহিনী চলেছে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। 'পথের কাঁটা' গল্পে রমেশচন্দ্র সেন এই অসহায় দম্পতির লড়াই এক ভিন্ন মাত্রায় এঁকেছেন। দশ-এগারো বছরের বালক যাদব হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়ায় নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য আর তখনই বাবার কাছে ধমক খায়— "এই হারামজাদা হইছে পথের কাঁটা।" চলার পথে গতিরুদ্ধ হয় ছেলের শ্লথগতিতে তাই পিতার চোখে সে কাঁটারূপ শত্রু। পিতার অনুভব এখানে কিছুটা স্বার্থান্ধও বটে। তাব গল্পের শেষে এক ইতিবাচক জীবনবোধ বাঁচার লড়াইকে নতুন করে প্রাণ দেয়। একটি সন্তান পিতার পথের কাঁটা হলেও শেষে পরাশর কলেরায় সদ্য মৃত এক মায়ের বুক থেকে দুধের শিশুকে পিতৃত্বের অধিকার দেয়। স্ত্রী মোহিনী বা অন্যদের কথাও তাকে এ সিদ্ধান্ত থেকে নড়াতে পারে না। নতুন করে বাঁচার আলো পায় অসহায় এক মাতৃহারা শিশু। ঘর ছেড়ে পথে নেমে একদল যখন কলেরা মহামারির শিকার হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছে তখন পাশে এক উদার মনের অপরিচিত পুরুষ মানুষ মাতৃহারা শিশুকে স্নেহ মমতায় কাছে টেনে নিচ্ছে। পথে নেমে নিজের সন্তানকে পরাশরের পথের কাঁটা মনে হলেও শেষে সেই অপরিচিত মৃতপ্রায় এক দুধের শিশুকে পুত্রস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে পিতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছে সে, চরম বিপর্যয়ের সময়েও মানবিকতার এ নজির জীবনের আশাবাদকেই তুলে ধরে।

সুখ-দুঃখ, আলো-আঁধারের মতোই, আশা-নিরাশার দোলায় ভরে থাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত। সেইরকম সাহিত্যের পাতায় একদিকে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির বিপর্যয়ে আশাবাদের সাথে হাত ধরে নৈরাশ্যের অন্ধকারও জীবনকে ভিন্ন খাঁতে টেনে নিয়ে যায়। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' কাহিনির নৈরাশ্যের সঙ্গে সাবিত্রী রায়ের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' গল্পটির কাহিনিতেও একটা বিষাদাত্মক পরিসমাপ্তি লক্ষ করা যায়। পরিবারের সবাই দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেও দীর্ঘদিনের আশ্রিতা পরিচারিকাকে ফেলে রেখে চলে যায়। একাকী নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকাই যেন তার ভবিতব্য হয়ে ওঠে।

সুলেখা সান্যালের 'ফল্গু' গল্পেও দেশভাগের ফলে হঠাৎ করেই পারিবারিক বিচ্ছেদের মুখোমুখি হতে হয় বিধবা প্রৌঢ়া মহেশ্বরীকে। সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েও শেষ মুহূর্তে নিজের আজন্ম পরিচিত মাটির টানকে ছিঁড়তে পারে না। তবে প্রতিবেশী মুসলমানদের ছোঁয়া চিরকাল সে বাঁচিয়ে চললেও নিঃসঙ্গ একাকী জীবনে সেই মুসলিম পরিবারের বালকই তার অসুস্থতার সময় ত্রাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িকতার

বিভেদের পাশে এ গল্প কিছুটা ইতিবাচক জীবনের সন্ধান দেয়।

দেশভাগ ও তার ভয়াবহ পরিণাম বাংলা-পাঞ্জাব উভয় সীমান্তের মানুষকেই এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছিল। আকস্মিকতার ধাক্কায় অনেকক্ষেত্রেই জীবনটাকে শুধু বাজি রাখতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকে। তবুও বাঁচার রসদটুকু অনেকের ভাগ্যেই জোটেনি। সুযোগসন্ধানী মানুষ স্বার্থের লোভে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অসহায় নিরাশ্রয় মানুষের উপরে, তার পরিণামে অকালে ঝরে গেছে কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভরা জীবন। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-য় দুর্গার মৃত্যু সেই সত্যকেই যেন তুলে ধরেছে। এখানে দুর্গা দুর্গতিনাশিনী নয় বরং নিজেই যেন শোষিত এক সত্তা। এ গল্পের এই দুটি চরিত্রকে সামনে রেখে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগের সময়কালের উত্তাপকে যেন অনুভব করাতে চেয়েছেন। তাই সুদাম ও দুর্গা ব্যক্তি পরিচয় থেকে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। নাম, পদবি, বংশ পরিচয়কে মুছে তারাই ইতিহসের নায়ক-নায়িকা যাদের অসহায় করুণ পরিণতি এক ক্রান্তিকালের ভয়াবহ সময়কে মনে করায়। দুই গঙ্গার মাঝে হারিয়ে যায় কত স্বপ্ন। এ গল্পে ট্র্যাজেডি তো সেই হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নের দলিল, যা ঐতিহাসিক ক্ষতকে নীরবে বহন করে চলেছে। আজকের আধুনিক জীবন সংকটে এই উদ্বাস্তু সমস্যা সারা পৃথিবীর কাছে সেই পুরোনো স্মৃতিকে নতুন করে মনে করাচ্ছে। বর্তমান সময়ে সারা পৃথিবীতে ২২.৫ মিলিয়ান শরণার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ৬ কোটি ৫৬ লক্ষ মানুষ ঘর বাড়ি ছেড়েছে। শরণার্থী হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে ২ কোটি ২৫ লক্ষ মানুষ। এদের মধ্যে ১ কোটি মানুষের কোনো পরিচয় নেই। কোনো নির্দিষ্ট জাতিগত পরিচয় না থাকায় এইসব মানুষেরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি ও স্বাধীনভাবে চলারও কোনো অধিকার পায় না। বিশ্বের ৫৫ শতাংশ শরণার্থী এসেছে দক্ষিণ সুদান, আফগানিস্তান এবং সিরিয়া থেকে। যুদ্ধবিগ্রহ সহ নানা সমস্যার কারণে বর্তমানে এইসব দেশের মানুষেরা শরণার্থী হিসেবে পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে চলে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশে রোহিঙ্গা উপজাতির অসংখ্য মানুষ শরণার্থী হিসেবে মিয়ানমার থেকে চলে এসেছে। সত্তরের দশক থেকে এই অনুপ্রবেশ শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। কক্সবাজারে 'কুতুপালং মেগা' শিবিরে ১০ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের এই শরণার্থী শিবির বিশ্বের মধ্যে সব থেকে বড়ো শিবির হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। প্রতি বছর জুন মাসের ২০ তারিখ আন্তর্জাতিক শরণার্থী দিবস পালনের মাধ্যমে বিশ্বের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে শরণার্থী নামে চিহ্নিত অসহায় মানুষগুলোর জাতিগত পরিচয় পাওয়ার দিকটিকে গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা ভাবা হয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি প্রদেশের (পাঞ্জাব ও বাংলা) মানুষ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশভাগ ও শরণার্থী হয়ে অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন লড়াই পার করে আজ স্থিতি লাভ করেছে। আজকে তাদের নিরাপদ জীবনের পিছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য যন্ত্রণা ও অশ্রুজলের করুণ কাহিনি, যা আজকের সারা বিশ্বের বিভিন্ন

প্রান্তের ছিন্নমূল মানুষদের কঠিন লড়াইকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা সমকালীন লেখকদের কলমে সেই গভীর যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কাহিনিকেই খুঁজে পাই। 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'-র সুদাম, দুর্গা বা 'সেই ছেলেটা' গল্পের রাজকুমারী, 'পথের কাঁটা' (রমেশচন্দ্র সেন) গল্পে পরাশর, মোহিনী, যাদব সবাই ভিন্ন নামের ব্যক্তি, যাদের অভিন্ন জীবনযন্ত্রণা আজকের অগণিত নারী-পুরুষ-শিশুর প্রতিচ্ছবি মাত্র।

যুগ বদলেছে, দেশ বদলেছে কিন্তু উদ্বাস্তু হওয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক কারণ খুব বেশি বদলায়নি। জাতিগত সহিংসতা, ধর্মীয় উগ্রতা, জাতীয়তাবোধ, রাজনৈতিক আদর্শগত কারণে সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তাহীনতাই এর প্রধান কারণ। সঙ্গে আছে দেশনেতাদের ভ্রান্ত জননীতি।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পে জ্যোতির্ময়ী দেবী বিচ্ছেদের যে সুর তার কাহিনিতে রোপণ করেছেন তার অনুরণন তো আজকের যে-কোনো শরণার্থী শিবির বা ছিন্নমূল মানুষদের খুব স্বাভাবিক চিত্র। শূন্য দৃষ্টিতে সুদামের ভালোবাসার মানুষের অন্বেষণ আজও চলেছে অন্য নামে অন্য পরিচয়ে। মানুষের এই যন্ত্রণাময় সফর থেকে ভবিষ্যতের কোন প্রজন্ম মুক্তি পাবে তার উত্তর আমাদের জানা নেই। মানবিক অনুভূতি ও শুভবুদ্ধিই হয়তো একদিন এই মানুষগুলিকে যথার্থ সম্মান দিতে পারবে, ফিরিয়ে দিতে পারবে তাদের মৌলিক অধিকারটুকু। নাহলে কত দুর্গা অকালেই পথে নেমে হারিয়ে যাবে খুঁজে না পাওয়ার দেশে। সমষ্টির মঙ্গল ব্যক্তিস্বার্থকে ঘিরেই তৈরি হয়। তাই প্রতিটি ব্যক্তির স্বপ্ন পূরণের দায় হয়তো কিছুটা হলেও রাষ্ট্রের থেকেই যায়। সেই দায়ভারকে অস্বীকার করলে বঞ্চনা ও অসাম্যের যে অন্ধকার সমাজের কিছু অংশকে রুদ্ধ করে রাখবে তার বিষময় ফল হয়তো আগামী প্রজন্মকে বহন করতে হবে। আগামীর সুন্দর সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সেই কারণে আজ আমাদের ফিরে যেতে হবে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাছে। তার সুরে সুর মিলিয়ে আজ আবার নতুন করে বলার দিন এসেছে—

...এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।[৫]

তথ্যসূত্র :

১. আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৬৪), শুচিব্রত সেন, অমিয় ঘোষ, পৃ. ৪৫৬
২. ভেদ-বিভেদ, দাঙ্গা, দেশভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সর্বভারতীয় গল্প সংকলন, ভদ্রেশ্বর মণ্ডল, জ্ঞান ভবন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশনা — আগস্ট ১৯৬৫, পৃ. ৪৮
৩. তদেব, পৃ. ৪৮
৪. তদেব, পৃ. ৪৮
৫. মেয়েদের লেখালেখি, সুতপা ভট্টাচার্য, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ — জানুয়ারি ২০০৪, পৃ. ১০৬

বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প

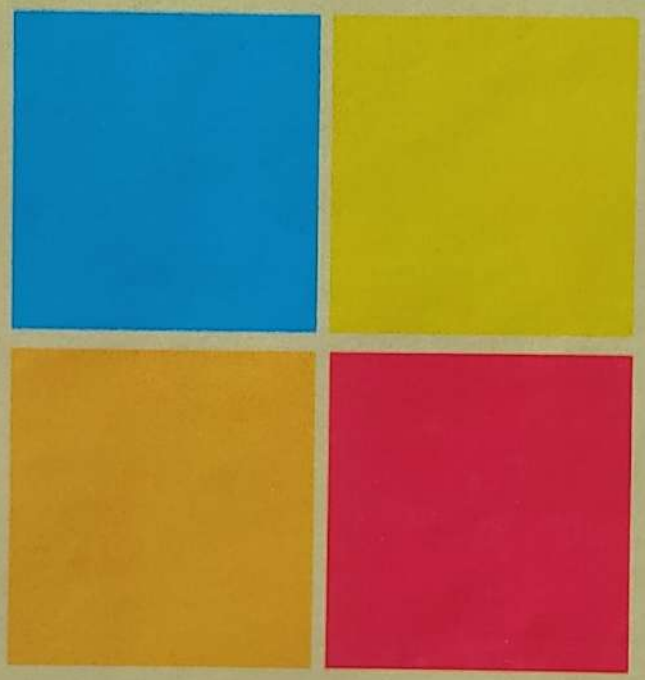

সম্পাদনা
মনোজ মণ্ডল
শ্রেয়া মণ্ডল

ভূমিকা : ড. তপনকুমার বিশ্বাস

বিশ্লেষণের আলোকে বাংলা ছোটগল্প

সম্পাদনা
ড. মনোজ মণ্ডল
শ্রেয়া মণ্ডল

ভূমিকা : ড. তপনকুমার বিশ্বাস

অধ্যয়ন পাবলিকেশন
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
(বিদ্যাসাগর টাওয়ার, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম ১৫এ, কলেজ স্ট্রিট, কল-৭৩)

সূচিপত্র

১। প্রসঙ্গ ছোটগল্প
ড. অচিন্ত্য দে ১৩

২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কুড়ানো মেয়ে' : বিশ্লেষণের আলোকে
ড. সঞ্জয় প্রামাণিক ২৫

৩। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বিবাহের বিজ্ঞাপন'
ঝুমা নস্কর ভাণ্ডারী ৩৫

৪। বাঙালির অস্মিতা ও শ্রীপতি সামন্ত
ড. শংকর প্রসাদ মাঝি ৪৫

৫। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : এক বিচিত্র চরিত্রের কথা
বৈশাখী গোস্বামী ৫৬

৬। হৃদয়েশ্বর মুকুজ্যে : জীবনচিত্রণের আঙ্গিক দস্তাবেজ
ড. উত্তম বিশ্বাস ৬১

৭। বিশ্লেষণের আলোকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প 'মশা'
রাজু মণ্ডল ৬৭

৮। আঁধার রাতে চোরা পথের বাঁকে : প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সংসার সীমান্তে'
ক্লেদজ শিল্পের শতদল
অজয়কুমার দাস ৭৯

৯। রাজশেখর বসু (পরশুরাম) এবং তাঁর 'শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'
ড.অনিকেত মহাপাত্র ১০০

১০। রাজশেখর বসুর 'উলটপুরাণ' : হাস্যরসিকের প্রতিবাদী কণ্ঠ—
ড. সুকান্ত মুখোপাধ্যায় ১০৮

১১। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চোর'
শ্রেয়া মণ্ডল ১১৭

১২। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'রস' – পরিণতির সন্ধানে
ড. অজয় মণ্ডল ১২৭

১৩। সুন্দর ও অসুন্দরের দ্বিরালাপ : প্রসঙ্গ সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্'
ড. নবনীতা বসু ১৪৮

২৮। পেশাবদল
প্রদ্যোত বিশ্বাস ৩৩৬
২৯। মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' : একটি পাঠ পর্যালোচনা
রচনা রায় ৩৪৬
৩০। জাতুধান : বিপন্ন মানুষের অন্নসংকটে স্বপ্নবয়ন ও স্বপ্নভঙ্গের জলছবি
ড. *বিপুল মণ্ডল* ৩৫৯
৩১। 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' : সমাজ বাস্তবতার অকৃত্রিম উপস্থাপনা
ড. *তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়* ৩৭৫
৩২। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাখির মা' : মাতৃত্বের বাৎসল্য ও আর্তি
ড. *মনোজ মণ্ডল* ৩৯০
৩৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বাদশা'
ড. *মিজানুর রহমান* ৪১৮
৩৪। গোম্ন—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
ড. *গোপা বিশ্বাস* ৪৩০
৩৫। লেখক পরিচিতি ৪৪৫

গোঘ্ন—সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ড. গোপা বিশ্বাস

কবিতা কল্পনানির্ভর হলেও ছোটগল্পকে বাস্তব ভূমিতে বিচরণ করতে হয় অনেকখানি। যেকোন কালজয়ী সাহিত্যই লেখকের জীবন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প 'গোঘ্ন' বাংলাদেশের প্রান্তিক জীবনের যন্ত্রণাময় লড়াই-এর বেঁচে থাকার গল্প। হার না মানা মানুষের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত মানবিক মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে থাকার গল্প। জীবন থেকে মৃত্যু এই পথ চলার সংগ্রামে পেটের তাগিদে পরিবার পরিজনের মুখে দুমুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে ঘর থেকে পথে নামতে হয় যাদের, এই গল্প সেই পথ চলার, যেখানে মানুষ ও মনুষ্যেতর দুটি প্রাণীর হৃদয়ের সংযোগ ঘটে— ভালোবাসা, স্নেহ ও মানবিকতার আলো স্বার্থপরতার অন্ধকার দূরে সরিয়ে হাজারও প্রতিবন্ধকতার সামনে জ্বলে ওঠার গল্প। গল্পের সময়টা বর্তমান সময় থেকে কিছুটা পিছনে ফেলে আসার, যখন গো-যানই ছিল গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক মানুষদের চলাচলের প্রধান অবলম্বন। আর গাড়ি টানার জন্য দুটো বলদ গোরু ছিল পরিবারের অন্যতম প্রধান সম্পদ। 'গোঘ্ন' গল্পটির পটভূমিকায় হারাই ও তার দুটি সন্তানসম বলদ ধনা ও মনার এক রাতের পথ চলার কাহিনী—যেন যুগ যুগ ধরে হারাই পথ চলছে। পিঠে জোয়াল নিয়ে সন্তানের ভার বইতে গিয়ে ক্লান্ত পিতা যেন অনন্তকাল ধরে পথ চলছে পথের সম্বলকে পথে ফেলে রেখে। হারাই আসলে চিরকালীন দুঃখী পিতা যে সংসারের ভার আবহমানকাল ধরেই বয়ে নিয়ে চলেছে।

কথা সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ এই চরিত্রের নিপুণ স্রষ্টা। যিনি বাস্তব জগৎ থেকেই তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্য মানুষের জীবনের জলছবি হয়ে উঠেছে। বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিকের জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার খোসবাসপুর গ্রামে দারকা নদীর তীরে, ১৯৩০-এর ১৪ই অক্টোবর। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তিনি বড় হয়ে উঠেছিলেন, ফলে শৈশব থেকেই প্রকৃতির সাথে তাঁর এক চিরকালীন জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল। মাত্র ৯ বছর বয়সে মাকে হারালেও খুব বেশি দুঃখ তিনি অনুভব করেননি। প্রকৃতির মধ্যে মিশে গিয়ে প্রকৃতির কোলেই তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। প্রকৃতির সাথে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার জন্যই তাঁর সাহিত্য স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর নিজস্ব অনুভবের কথা তিনি নিজের মতন করে বলেছেন বলেই সমকালীন আন্যান্য লেখকদের পাশে তাঁকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর মৌলিকতা ও কৃতিত্বের জন্য আনন্দ পুরস্কার, সাহিত্য আকাডেমি পুরস্কার, ভুয়ালকা পুরস্কার, বঙ্কিম পুরস্কার ও নরিসংহ দাস পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের শিক্ষাজীবন শুরু হয় নবগ্রাম জেলার গোপালপুর মুক্তকেশী বিদ্যালয় থেকে। এরপর স্কুলের পাঠ শেষে তিনি ভর্তি হন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে। সেখান থেকে ১৯৫০ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন। চাকরি দিয়ে কর্মজীবন শুরু হলেও পরবর্তী সময়ে তিনি 'ইত্তেকাফ' পত্রিকার সহ সম্পাদক হিসাবে নিজের পরিচিতি গড়ে তোলেন। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে লোকনাট্য দল 'আলকাপের' সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাচ, গান, অভিনয়ে অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গসহ বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মতো বিভিন্ন রাজ্যেও তিনি তাঁর দলের সাথে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে বিভিন্ন রাজ্যের সংস্কৃতির সাথে তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কলকাতায় বসবাস করলেও তাঁর মন পড়ে থাকতো মুর্শিদাবাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে। ফলে কলকাতা তাঁর কাছে প্রবাসের মতই মনে হতো।

প্রকৃতির সাথে নিকট আত্মীয়তা তাঁর সাহিত্য জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিল। প্রতিটি উপন্যাসেই তিনি রাঢ় বাংলার অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যকে তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির বন্যরূপ ও তার মোহময় হাতছানির কাছে তিনি বারে বারে নতজানু হয়েছেন। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় তিনি বলেছেন—''মানুষ প্রকৃতির সন্তান বলে তার কাছে শ্লীলতা, অশ্লীলতা নেই। শুধু আছে জীবন মুক্ত উদ্দাম জড় জীবন, এই জীবন আমি দেখেছি, ভালোবেসেছি। তাদের কথাই বলতে চেয়েছি।''

তাঁর এই বলাই সাহিত্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে। তাঁর সমকালে তিনি হয়ে উঠেছেন স্বতন্ত্র এক লেখক। জটিলতা বর্জিত সহজ সরল জীবনবোধ সব শ্রেণীর লেখাতেই ধরা পড়েছে।

সমগ্র জীবনে তিনি মোট ১৫০টি উপন্যাস ও ৩০৬টি ছোটগল্প লিখেছেন। ছোট শিশুদের জন্য তিনি রচনা করেছিলেন 'গোয়েন্দা কর্ণেল' নামক চরিত্র এবং বড়দের জন্য রচনা করেছিলেন 'কর্ণেল সমগ্র'।

তাঁর বিখ্যাত কিছু সাহিত্য কর্ম :কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি (১৯৮০), বিপজ্জনক ১১ (১৯৮৫), সোনার ঠাকুর (১৯৮৯)। তৃণভূমি, অলীক মানুষ (১৯৮৮) ইত্যাদি স্মরণীয় হয়ে আছে।

বিখ্যাত কয়েকটি উপন্যাস হল :নীল ঘরে নটী (১৯৬৬), তৃণভূমি (১৯৭০), পিঞ্জর সোহাগিনী (১৯৬৬), হিজল কন্যা (১৯৬৭), কিংবদন্তীর নায়ক (১৯৬৯), নিষিদ্ধ প্রান্তর (১৯৭১), এক বোন পারুল (১৯৭২), মায়া মৃদঙ্গ (১৯৭২), নির্বাসনের দিন (১৯৭২), প্রেম ঘৃণা দাহ (১৯৭৫), জ্যোৎস্নায় রক্তের গন্ধ (১৯৭৬), পেছনের আততায়ী (১৯৮৩), নদীর মতন (১৯৮৪), রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র

(১৯৮৪), অমর্ত্য প্রেমকথা (১৯৮৮), কাগজের রক্তের দাগ (১৯৮৯), নিষিদ্ধ অরণ্য (১৯৮৯), জানমারি (১৯৮৯)।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলন হল : কলকাতার কেঁদো (১৯৭২), একালের বাংলা গল্প (১৯৭৫), নন্টু মামার গাড়ি (১৯৭৫), বনের আসর (১৯৭৫), নিঝুম রাতের আতঙ্ক (১৯৭৯), ভয় ভুতুড়ে (১৯৮০), অলৌকিক চাকতি রহস্য (১৯৮১), ম্যাজিশিয়ান মামা (১৯৮৩), রাণী ঘাটের বৃত্তান্ত (১৯৮৬), মোতি বিবির দরগা (১৯৮৬), দারুব্রহ্ম কথা (১৯৮৭), বনে গেছেন রাম শর্মা (১৯৮৭)।

তাঁর অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি সরকারী ও বেসরকারী নানা পুরস্কার পেয়েছেন। আর সব থেকে বড়ো পুরস্কার তিনি পেয়েছেন পাঠকের কাছ থেকে। বাংলার অসংখ্য পাঠকের হৃদয়ে তিনি চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন।

২

'গোম্ন' গল্পটি শুরুই হয়েছে হারাই এর মৃত ভাই দোলাই-এর প্রসঙ্গ দিয়ে। হারাই যার আসল নাম হারুণ আলি। নিজের গ্রাম বেখরাই থেকে অনেক দূরে চারু মাস্টারের বাড়িতে এসেছে মৃত ভাই দোলাই-এর দেওয়া কথা রাখতে। দোলাই ও হারাই দুই ভাই, যাদের সাথে রাঢ় দেশের চারু মাস্টারের পরিবারের 'বংশ পরম্পরা কুটুম্বিতো', একসময় হারাইয়ের বাপও 'মরশুমে এলে চারু মাস্টারকে দেখা না দিয়ে যেতো না।' সেই বাড়িতে হারাই মাঘ মাসের শেষে এসেছে মৃত ভাই দোলাই-এর দেওয়া কথা রাখতে। চারু মাস্টারের মেয়ের বিয়ে ফাল্গুন মাসে আর সেই বিয়েতে দোলাই কলাই-এর ডাল আর পাকা কুমড়ো দিতে চেয়েছিলো। ভাই কবরে গেলে দাদা সত্য পালনের জন্য নিজের গোরু ধনা, মনার টানা গাড়ীতে দুরাতের রাস্তা পাড়ি দিয়ে এসে রাঢ় দেশে চারু মাস্টারের বাড়িতে। আন্তরিকতার সুতোয় বাঁধা এ সম্পর্কে চারু মাস্টারও তাকে দিয়েছে তিন বস্তা ধান, গোরুর খাবার জন্য খড়।

গল্পের সূচনাতে হারাই-এর পরিচয়টাই সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। চারু মাস্টারের বেহালার সুরের কারুণ্য এখানে হারাইদের মতন প্রান্তিক মানুষদের জীবনের বহমান দুঃখ বেদনাকে এক সুরে বেঁধে দিয়েছে। হারাই-এর মতন খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতিদিনের সংগ্রামের ছবি গল্পের শুরুতেই প্রকাশ পেয়েছে, চারু মাস্টারের মেয়ের সাথে হারাইয়ের কথোপকথনে। মেয়েটি অবাক হয়ে শোনে হারাই চাচার খাওয়ার তালিকা, মোটা দানাওয়ালা চাল খায় তারা, আর তার সাথে ''ইয়া মোটা মাসকলাই আটার লাহারি। ছাতু ভুজা, গেঁহু উঠলে দুটা মাস সুখ আম কাঁঠালের সঙ্গে গুঁহর আটার চাপড়ি।''

আর আউষ চালের ভাত মাসের মধ্যে কটা দিনই তারা খেতে পায়। আর চারু মাস্টারের দেওয়া ধান থেকে সুস্বাদু 'শাহুদানা' চাল নিতেই তো তাদের বহুদূর থেকে আসতে হয়।

অন্য সময় দল বেঁধে আসলেও মাঘ মাসের শেষে ভাই দোলাই-এর দেওয়া কথা রাখতে হারাই এসেছে কলাই-এর ডাল আর পাকা কুমড়ো নিয়ে। কিন্তু ফেরবার সময় 'বাওয়ালি' গরুটার শরীরের অবস্থা তার ভালো মনে হয়নি। আসার সময় থেকেই বলদ গরুটির শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল 'ছ্যারানি' দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। চারু মাস্টার যাওয়ার পথে সানকিডাঙায় পরিমল বদ্যির শরণাপন্ন হতে বলেছিলো, অবলা জীবের কষ্টের কথা ভেবে।

গল্পটির দ্বিতীয় অংশের কাহিনী আরও ঘনীভূত হয়েছে অসুস্থ বলদ গরুটিকে কেন্দ্র করে। ধনা নামের গরুটিকে গাড়িতে জুড়ে দিলেও তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা হারাই-এর মানবিক দিকটাকে ক্রমশ পরিস্ফুট করে তুলেছে। মাঘ মাসের শীতের সন্ধ্যা পাকা সড়কের উপর ধীরে ধীরে যখন নেমে আসতে থাকে, তখন সানকিডাঙায় গো বদ্যির শরণাপন্ন হয়ে পাঁচ সিকের বদলে বারো আনায় রফা করে ধনার অন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়। পিরিমল বদ্যির কাছে অচেনা হারাই অসহায়ভাবে নিজেকে সমর্পণ করে পোষা অবলা জীবটাকে রক্ষা করার জন্য। মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক এ বিশ্বাস রেখে গাছের নীচে রাখা বলদ গরু দুটো নিয়ে শীতের রাতের প্রথম প্রহর নামতে থাকা অন্ধকারে খুব দ্রুত স্থান ত্যাগ করে মেদীপুরের বাজারে চলে যেতে চায়। পিরিমলের কাছে সে জানতে পেরেছে কালুদিয়াড়ের ইসমিল নামে কোনো ব্যক্তি এই গাছে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। অপরিচিত জায়গায় অসুস্থ বলদ ধনার মলত্যাগের কটু গন্ধ সাথে তাকে নিয়ে নানা চিন্তা। মৃত ইসমিলের প্রসঙ্গ—জনমানবহীন প্রান্তরে হারাই কেবল দোয়া করে সর্বশক্তিমানের কাছে যাতে সে নিরাপদে বাড়ির দিকে রওনা হতে পারে। সামনে তার এক ভয়ের রাত, যা তাকে পার করতে হবে এ কথা তার গাড়োয়ানির অভিজ্ঞতায় ভালোভাবেই অনুভব করতে পারে সে। শীতের নিশ্ছিন্দ্র নিঝুম চারিপাশের বিরুদ্ধ পরিবেশ-এ সব যেন হারাই-এর মস্তিষ্কের মধ্যে এক আতঙ্কে সঞ্চার করে—কোনো কিছুই যেন আয়ত্তের মধ্যে নেই। এই প্রতিকূলতার মাঝে "মাকড়সার জালে আটকে পড়া পোকার মতো নিঃসার হয়ে জুলজুলে চোখে বসে থাকে বাঘড়ীদেশের গাড়োয়ান।"

জীবনের পথে সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতায় বিপদের সম্মুখীন সে অনেকবারই হয়েছে। গাড়োয়ানী জীবনে রাতে পথ চলার সময় তারা তাই একা পথে নামে না। দল বেধে চলে কিন্তু এবারে সে অসময়ে একাই এসেছে। মাস্টারের মেয়ের বিয়েতে জিনিস দেওয়ার উপলক্ষ্যে। কিন্তু এখন শীতের রাতের অন্ধকারে কিছুটা যেন সে মুহ্যমান হয়ে শোক ও অসহায়তা দুইই প্রকাশ করে ফেলে। তিন বস্তা ধান তার কাছ তিন বস্তা সোনার মতো দামী। ঘরের ছেলেমেয়েদের এই শাহুদানা সুস্বাদু চালের প্রতি অধীর অপেক্ষা হারাইকে আবার পথ চলার উৎসাহ যোগায়। ধনাকে আবার ওঠানোর জন্য পিতার মতো স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চায়। ধনার কষ্ট উপলব্ধি করে সে। এই শরীরে জোয়াল কাঁধে গাড়ি চালানোর ক্ষমতা তার নেই, এটা চিন্তা করে অদ্ভুত এক

সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলে। ধনাকে সে পিছনে পাছোটের বাঁশের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে ভারমুক্ত করে 'নিজে বাঁদিকের জোয়াল ধরে দুহাতে বুকের সঙ্গে জোয়ালটা চেপে গর্জন করে টানে সে', গাড়ি গড়াতে থাকে পশু ও মানুষের সম প্রচেষ্টায়। মানুষ হয়েও হারাই জীবন্ত জানোয়ারে পরিণত হয়। গাড়ীর গড়ানোর শব্দে জীবনের গভীর এক অনুভূতি ক্রমে হারাইকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। চারু মাস্টারের বেহালার সুর, চলন্ত গাড়ীর শব্দ ও একটি মানুষ ও একটি পশুর হৃৎপিণ্ডের শব্দের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। পথ চলতে গিয়ে নির্জন অন্ধকার রাত্রে হারাই-এর মনে নানা কথার জন্ম দেয়। মানুষ হয়েও গো জন্মের কষ্টকে উপলব্ধি করে সে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জানোয়ার সুলভ কাজ করলেও মানুষ তার স্বরূপ সব সময় অনুভব করে না, আসলে মানুষ মাত্রই ভার বহনকারী জীব—আর সবাইকেই উর্ধ্বতন কারুর না কারুর নির্দেশে চলতে হয়। আর যাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হয় তারাই আসলে 'মুনিব'। গো-যান চলে মানুষের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু মানুষ কি নিজে স্বাধীন? তা কিন্তু নয়, তাকেও চালনা করে অন্য কোন উর্ধ্বতন শক্তি। জীবনের এই চরম সত্যকে হারাই উপলব্ধি করে এক বিশেষ ক্ষণে এসে। কিন্তু দুক্রোশ রাস্তা যেন অনন্ত দীর্ঘ হয়ে যায় তার কাছে। সময় যেন ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড ছাড়িয়ে দীর্ঘ এক কালে পরিণত হয়, মনে হয় সে তার পোষা বলদ মনার সাথে আজন্মকাল ধরে গাড়ি টেনে যাচ্ছে। আর এই জোয়াল টানতে টানতেই সে একদিন মারা যাবে। ভয় হয় তার।

আচমকাই রাতের অন্ধকারে দিলজান নামে একজনের আগমন হয়। হারাই-এর সাথে ভাব জমিয়ে তার অসুস্থ বলদ ধনাকে নিজে আলো জ্বেলে পরখ করে। তারপরই নিদান দেয় ধনার অসুস্থতা ঠিক হওয়ার নয়—হয়তো রাত কাটবে না। হারাই বিষণ্ণ হয়ে যায়। এক মুহূর্তে আশার আলো নিভে যায়। বদ্যির ওষুধে আর তার ভালোবাসা প্রার্থনায় ধনা সেরে উঠবে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তার বিবির কাছে, যেখানে পদ্মার জল পাত্রে ভরে অপেক্ষা করছে সে ধনা মনার পা ধুইয়ে দেবে বলে। সন্তানতুল্য এই পোষা বলদদুটো তার জীবন ধারণের অন্যতম আশা ভরসা। ধনা বাঁচবে—তার বেঁচে থাকার উপর নির্ভর করছে হারাই-এর জীবনধারণ। নতুন বলদ কেনার ক্ষমতা তার নেই। তাই দিলজান হালালের জন্য তিরিশ টাকায় ধনাকে কিনে নিতে চাইলে হারাই-এর অন্তরাত্মাসহ সমস্ত কিছু 'না' বলে ওঠে। তার নিজের কলজে দিতে প্রস্তুত সে, কিন্তু ধনা তার সন্তান, অসুস্থ বলে তাকে সে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে মরার আগে মেরে ফেলতে পারবে না। পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দর তুললেও দিলজানকে কঠিন ভাবে প্রত্যাখান করে হারাই। দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে মেদীপুর চটির দিকে।

অনেক কষ্টে মেদীপুর চটিতে পৌঁছে নিজে বিশ্রাম নেয়। গরু দুটোকেও বিশ্রাম দেয়। ভোরবেলা প্রচণ্ড শীতে নামাজ পড়তে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে সে। ঈশ্বরকে সে তার মনের সমস্ত দুঃখ অসহায়তার কথা বোঝাতে চায়। এমনকী নিজে ঔরসজাত সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে ধনার জীবন ভিক্ষা করে সে সর্বশক্তিমানের কাছে। এই

বলদটি না থাকলে তার জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে—পথের ভিখিরী হয়ে যাবে সে। এই অসহায়তার কথা সেই সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কাকেই বা জানাবে সে।

মেদীপুর চটিতে সকালবেলা অসুস্থ ধনাকে নিয়ে উৎসুক জনতা ভিড় করে নানা কথা বলতে থাকে। ধনার আর বাঁচার আশা নেই এই কথা শুনে ক্রমশ যেন ম্রিয়মান হয়ে পড়ে হারাই। শেষে আসে গত রাতের দিলজান। এবার সে তিরিশ টাকায় হালালের জন্য ধনাকে নিতে চাইলে হারাই দেখে সেখানে উপস্থিত সমবেত জনতা সবাই দিলজানের কথাতেই সম্মতি প্রকাশ করছে। আজ আর তার প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে না। হাতে গুজে দেওয়া তিনটি নোট নিয়ে ব্যর্থ পিতার মতোই সন্তানের মৃত্যুকে যেন আটকাতে পারে না। নিজের হাতে পালন করা তার সন্তানসম ধনাকে সে চোখের জলে বিদায় দেয়। সান্ত্বনা কেবল এটাই ধনা মরে গেলে ভাগাড়ে অন্য জীবের খাদ্য হওয়া থেকে হালাল করে মানুষের খাদ্য তো হয়ে উঠলো। উপস্থিত অপরিচিত জনতার মাঝে মুহ্যমান হারাই একা শূন্য দৃষ্টিতে বসে থাকে চোখে তার স্বজন হারানোর বেদনা তার সন্তানসম বলদ গরুটি পথে অসুস্থ হয়ে মারা গেছে বিদেশ বিভূঁয়ে একাকী অসহায় ভাবে তাকে সেটা মেনে নিতে হচ্ছে। এ যন্ত্রণা যে বোঝাতে পারে না।

আবার পথে নামে হারাই বাঁওয়ালী গোরুর জায়গায় নিজেকে জুড়ে দিয়ে গাড়ী টানে সে। সেই পথে ভট্টমাটির বদর হাজির সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। ভট্টমাটির সম্পন্ন গৃহস্থ বদর হাজি। নিজস্ব লোকালয়ে তিনি ইমানদার তীর্থ ফেরত মানুষ। গ্রামের চাষবাসের শুভ সূচনা তার হাতেই হয়। আখের গুড় বানানোর মরসুম শুরু হবে তারই উপস্থিতিতে। সেই কাজের জন্য তদারক করতে কর্মচারীদের 'মিঠে কথায় তম্বি' করে তালগাছের পাতা গোছানোর ফাঁকেই হারাইকে গাড়ী টানতে দেখতে পেলেন। মানুষ টানা ঠেলাগাড়ী আর রিকশা দেখলেও এভাবে গরুর গাড়ি মানুষকে টেনে নিতে সে কখনো দেখেনি। কৌতূহলের সাথে সব জানতে চেয়ে অবাক হন হাজি সাহেব। তার দুঃখ লাঘব করার উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তার আশপাশের গাড়োয়ানদের সাথে তার গাড়ীকে জুড়ে দেওয়ার কথা বলে পরিচিতও করান অনেকের সাথে। তাদের সাথে কথা বলে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না হারাই—অনেক গারোয়ান থাকলেও তার বাড়ির দিকের গ্রামে কেউ যাবে না। তবুও হাজী সাহেবের আন্তরিকতায় ও আতিথ্যে অন্যান্য সহযাত্রীদের মাঝে নিজের দুঃখ ভুলে যায় হারাই। সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরে মৌলবি সাহেব ও আমির হাজী সাহেবের সাথে একসাথে খেতে বসে সংকোচে। জীবনের এক মহামূল্যবান অধ্যায় মনে করে সে খাওয়া শুরু করতেই হাজী সাহেবের কথা তার কানে আসে। তার ভাগ্নে ব্যাটা দিলজান নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে মেদীপুরের চটি থেকে হালাল হওয়া গোস্ত নিয়ে এসেছে। দিলজান আর হালাল মাংস এই শব্দ দুটি হারাই-এর মুখ থেকে মাংসের টুকরোকে বার করে নিয়ে আসে। বাইরে বসে ওয়াক তোলে। শুরু হয় বুকফাটা কান্না। হারাই এই মাংসকে হারাম মাংস বলতেইহাজী সাহেব তাকে নানা গালমন্দ করে। কারোর কোনো কথাই আজ আর

হারাই-এর কানে ঢোকে না। তার সন্তানসম ধনার হালাল করা মাংস আসলে তার কাছে নিজের সন্তানের শরীরের মাংসের মতই—যা তাকে নিদারুণ শোকগ্রস্ত করে তোলে। চোখের জলে বিলাপ করতে থাকে সে—''হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গো—এক পদ্মার পানিতেও এই আগুন নিভবে না গো।''

ধনাকে হারিয়ে ফেলার কষ্ট সহস্রগুণ হয়ে ফিরে আসে হারাই-এর কাছে। অন্য গাড়োয়ানরা দেখে একজন বয়স্ক মানুষ জবাই করা প্রাণীর মতন কেবল ছটফট করছে। জীবনকে এভাবে দেখার মধ্যে হারাই ওরফে হারুণ আলির বিষাদমাখা জীবন অধ্যায় করুণ সুরে বাজতে থাকে ঠিক যেন চারু মাস্টারের বেহালার সুর। আকাশ বাতাস জুড়ে হারুণ আলি শুনতে পায় প্রকৃতির মাঝে সেই বিষাদময় সুরের মূর্চ্ছনা। এ যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে চলছে তার আর শেষ নেই। এরই মাঝে জীবনের যাত্রাপথে পৃথিবীর এক কোণে কদিনের আশ্রয়ের দিকে পা বাড়াতে হবে জীবনের দাবী যে শেষ হয়নি হারুণ আলির।

৩

ছোটগল্পের প্রাণভোমরা লুকিয়ে থাকে তার নামকরণের মধ্যে। নামের তাৎপর্যপূর্ণ দেউড়ি পেরিয়ে গল্পের অন্দরে প্রবেশ করলে তবেই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর বলিষ্ঠ ভাবনার মাধ্যমে 'গোঘ্ন' যে গল্পটির পটভূমিকা নির্মাণ করেছেন, যার নামকরণ যথার্থ ও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

'গোঘ্ন' গল্পটির নামকরণ বিষয়ের পূর্বে গল্পটির 'গোঘ্ন' শব্দটির তাৎপর্য আলোচনা করা যাক। 'গোঘ্ন'-এর অর্থ হল গো হত্যাকারী। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ হল যার জন্য গো হত্যা করা হয়। এটা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে অতিথির জন্য গোহত্যা করা হতো, তাকে আপ্যায়ন করার জন্য। অতিথির সঙ্গে গো-বধের দীর্ঘ সময় অবধি সরাসরি সম্বন্ধ থাকার জন্য অতিথির জন্য 'গো হত্যাকারী/অন্যের দ্বারা হত্যাকারী শব্দ প্রচলিত হয়েছিল। লেখক এই শব্দটিকে নামকরণের জন্য নির্বাচন করেছেন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র হারুণ আলির জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তকে তুলে ধরার জন্য।

কাহিনীর প্রেক্ষাপট লেখক হারুণ আলি ও তার দুটি সন্তানসম বলদ গরু ধনা ও মনার সম্পর্কের মানবিক রসায়নের দিকটিকে এক ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরেছেন। বেঘরাই নামক গ্রামের প্রান্তিক খেটে খাওয়া হারুণ আলির জীবন সংগ্রাম ও কঠিন নিয়তির কাছে হার মানা নিষ্ঠুর নিয়তির ট্র্যাজেডিকে পাঠক অনুধাবন করতে পেরেছে। গল্পের শুরু রাঢ় দেশের সমৃদ্ধ গ্রাম চারু মাস্টারের বাড়িতে। সাদা শাহুদানা মিষ্টি ভাতের প্রসঙ্গে হারাই চারু মাস্টারের মেয়েকে জানিয়েছে তাদের দেশের মানুষদের অতি সাধারণ জীবনযাপনের কথা। সুন্দর শাহুদানা স্বাদের চাল খায় একমাত্র আমীর লোকজনরা। তারা বছরের তিনটে মাস মাত্র এই সুদূর রাঢ় অঞ্চল থেকে অনেক কষ্টে

সংগ্রহ করা চালের ভাত খেতে পায়। বাদবাকি সময় গেঁহু আটার রুটি বা ফল ও অন্যান্য কিছু দিয়ে পেট ভরায়। দুটি বলদ গরুর খাবার খড় ও হারাই চারু মাস্টারের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। তাদের নিয়তিও যেন হারাই-এর কষ্ট করে ধান সংগ্রহের সঙ্গে বাঁধা। দু-রাতের পথ গো-যানে পাড়ি দিয়ে চারু মাস্টারের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মৃত ভাই দোলাই-এর দেওয়া কথা রাখতে এসেছিলো হারাই। দুবস্তা কলাই এর ডাল কুড়িটা পাকা কুমড়ো দিয়ে ভাইয়ের দেওয়া কথা রেখেছিল সে। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় হলো বিপর্যয়। বাঁওয়ালী বলদটার শরীর উত্তরোত্তর খারাপ হতে শুরু করলো। চারু মাস্টারের পরামর্শ মেনে পিরিমল বদ্যিকে দেখিয়ে তার দেওয়া ওষুধ খাইয়েও লাভ বিশেষ হলো না। এদিকে একা রাতের বেলা এক অপরিচিত রাস্তায় থাকার সাহস তার হলো না বিশেষত সেই গাছের উপরে একজন অপঘাতে মারা গেছে শুনে। শুরু হল হারাইয়ের এক অমানুষিক লড়াই। অসুস্থ বলদটা তার সন্তানের মতো তাকে সুস্থভাবে ঘরে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাকে হালকা করে নিজে কাঁধে জোয়াল টেনে এগিয়ে চললো মেদীপুরের বাজারের দিকে। অনন্ত দুঃসহ সে যাত্রাপথ। চিন্তাগ্রস্ত, অমানুষিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হারাই থামতে পারে না। একটি ক্ষণও যেন এক একটি যুগের সমান হয়ে যায়। চারু মাস্টারের বেহালার সুরের মূর্চ্ছনা যেন হারাই-এর জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণার সাথে মিলেমিশে যায়। মধ্য রাতে দিলজানের আগমন হয়—যে ধনাকে কিনে নিতে চায় হালাল করার জন্য। মৃত গরু মানুষের খাদ্য হয় না, তাই এইরকম অসুস্থ গোরু সস্তায় কিনে খাদ্যে রূপান্তরিত করার জন্য দিলজান মরিয়া হয়ে ওঠে। হারাইকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত দিতে চায় সে। কিন্তু হারাই প্রাণে ধরে এ কাজ করতে পারে না। ধনা তার শুধু পালিত পশুই নয়, সে তার সন্তানের মতো। অসুস্থ বলে তাকে পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দিতে সে একেবারেই অপারগ। কিন্তু হারাই-এর ভালোবাসার টানে, সর্বশক্তিমানের কাছে তার প্রার্থনাও বিফলে যায়। নিজে মেদীপুরের চটি পর্যন্ত জোয়াল টেনে অসুস্থ বোধ করলেও নিজেকে নয় ধনাকে নিয়েই তার দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে জমা হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর কোনো উপায় থাকে না। উপস্থিত জনতার চাপে সেই গতরাতের দিলজানই ধনাকে তিরিশ টাকায় হালাল করার জন্য নিয়ে যায়। শূন্য হৃদয়ে সন্তানহারা পিতার মতো আবার জোয়াল টেনে বাড়ির পথে রওনা দেয়। পথে ভট্টমাটির বদর হাজী হারাইকে অতিথি হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে। তার ভার লাঘবের চেষ্টাও করে। আমীরদের সাথে খেতে বসে হারাই সুদৃশ্য পাত্র থেকে তোলা মাংসে মুখ দিতেই শুনতে পায় হাজী সাহেবের ভাগ্নে দিলজান নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে হালাল করা মাংস কিনে এনেছে আর তাই দিয়েই অতিথিকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে। এক মুহূর্তে হারাই এর জীবন যেন স্তব্ধ হয়ে যায়। তারই আদরে স্নেহে সন্তানের মতো প্রতিপালিত ধনার হালাল করা রান্না মাংস সে মুখে দিয়েছে। এ যে তার নিজের সন্তানের মাংস খাওয়ার মতই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার। তার অন্তরাত্মা যেন যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়। ক্রমাগত ওক তুলে বুক চাপড়ে অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে সে। কিন্তু

তার সেই অসহায় যন্ত্রণা বোঝার মতো ক্ষমতা সেই মুহূর্তে কারো হয় না। হারাই-এর যন্ত্রণা কালের চক্রে ক্রমাগত যেন ঘুরপাক খায়। এক পদ্মা নদীর জলও তার এই যন্ত্রণার তীব্রতাকে কমাতে পারবে না—এতটাই দুঃসহ হয়ে ওঠে সেই ব্যথা।

'গোঘ্ন' এই কথাটির তাৎপর্য গল্পকার গল্পের শেষে এসেই দেখিয়েছেন। ছোটগল্পের চমক তার সমাপ্তিতে, এই বিষয়টি এই গল্পে যেমন চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, ঠিক তেমনই নামকরণের অন্তর্নিহিত ভাবনাও গল্পের শেষে এসে ধরা পড়েছে। হারাই-এর অসুস্থ বলদটি দিলজান হালালের জন্য কিনে নিয়েছে আর সেই মাংস বদর হাজী অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহার করেছে। এখানে 'গোঘ্ন' হিসেবে দিলজানকে যেমন চিহ্নিত করা যায় আর বদর হাজীও পরোক্ষে 'গোঘ্ন' হিসেবেই বিশেষিত হন। রীতি বা প্রথা অনুযায়ী অতিথি আপ্যায়নে হালাল মাংসের জন্য গো মাংস ব্যবহারকারীকে গোঘ্ন বলা হয়, সেই সূত্রে প্রথমে দিলজান তারপরে বদর হাজীকে 'গোঘ্ন' হিসেবে চিহ্নিত করলে গল্পের নামকরণের আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন করা যায়। কিন্তু গল্পটির নামকরণের ব্যঞ্জনাধর্মিতা লুকিয়ে আছে অন্য জায়গায়। 'গোঘ্ন' এই রীতির সাথে এই গল্পে শুধু অতিথি আপ্যায়নই মিশে নেই বরং হারাই নামে এক অসহায় মানুষের হৃদয় নিঙরানো অতলান্ত ব্যথার সংযোগ আছে। হারাই দুঃস্থ গরিব খেটে খাওয়া মানুষ যে প্রতিদিন দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে না, সেই তার হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে এক বোবা জানোয়ারকে। অর্থকড়ি, নাম কোনো কিছুর বিনিময়েই এই সৎ মানুষটি তার অকৃত্রিম ভালোবাসাকে বিসর্জন দেয়নি। এমনকী তার আত্মজ ঔরসজাত সন্তানের প্রাণের বিনিময়ে যে বলদটির জীবন ভিক্ষা করেছে সেই সর্বশক্তিমানের কাছে। অজান্তে তারই মাংস মুখে দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় সে ছটফট করেছে। 'গোঘ্ন' সেই যন্ত্রণার মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছে। যদি দিলজান 'গোঘ্ন'-র খোঁজে না আসতো আর হারাই যদি এভাবে তার সন্তানতুল্য বলদটির রান্না মাংস মুখে না তুলতো তাহলে এই নামের তাৎপর্য এত ব্যঞ্জনাধর্মী হতো না। তাই গল্পটির নামকরণটি হারাই-এর মানসিক যন্ত্রণার দিককে তুলে ধরতে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়েছে। অন্যদিকে একটি মূক বোবা পশুকে ঘিরে একটি মানুষের ভালোবাসার বন্ধনকে বোঝাতেও এই নামকরণটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 'গোঘ্ন' রীতির প্রচলন বহু প্রাচীনকাল থেকে হয়ে আসছে। অতিথি সৎকারের সাথে গো-মাংস পরিবেশনের বহু প্রাচীন রীতিকে বলা গল্পকারের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এই রীতির সাথে হারুণ আলি ওরফে হারাই-এর মানসিক যন্ত্রণার দিকটিকে নিপুণ দক্ষতায় লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন আর তার সাথে একটি ব্যক্তি মানুষের (হারাই) মানবিকতা, অবলা পশুকে ঘিরে নিঃস্বার্থ আবেগ ও সহানুভূতি সর্বোপরি তাকে হারিয়ে ফেলার অসহনীয় দুঃখকেই লেখক সযত্নে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছেন। আর সেই বক্তব্যের দিকটিকে প্রতিফলিত করাই ছিল লেখকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আর তাই গল্পের নামকরণটি সার্থক হয়েছে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 'গোঘ্ন' ছাড়া অন্য কোন নাম গল্পটির

বিষয়ের সাথে এভাবে সপ্রযুক্ত হতে পারতো না, তাই নামকরণটি যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে এই কথা তর্কাতীতভাবে সত্য ও যুক্তিগ্রাহ্য।

৪

ছোটগল্প হিসেবে 'গোঘ্ন' একটি অন্যতম সার্থক ছোটগল্প। আকারের দিক থেকে সামান্য স্থূলতা থাকলেও কাহিনীর বুনোট ও শেষে আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত পরিণতি ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যকে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। গল্পের আখ্যান, কাহিনীর অগ্রগতি তিনটি স্তরে গল্পের নাটকীয় চলন ও উত্তেজনার পারদ বৃদ্ধি, প্রধান চরিত্রের মনের অন্তর্গত একটি বিশেষ দিকের উন্মোচন, সংলাপ, আঞ্চলিকতার সঠিক প্রয়োগ, বাস্তব জীবনের নিদারুণ ছবি ও শেষে আকস্মিক পরিণতি এই ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছে।

সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বাস্তব জীবন থেকে সংগ্রহ করেন। ফলে তাঁর লেখার মধ্যে কোথাও কষ্টকল্পিত অবাস্তবতার সামান্যতম লেখাও থাকে না। বরং জীবনের নগ্ন কিছু সত্যতার ছবি পাঠকের কাছে ভিন্ন আঙ্গিকে অসাধারণ তাৎপর্যধর্মী হয়ে ওঠে। 'গোঘ্ন' গল্পটি লেখকের অন্যতম সেরা ছোটগল্প, সেখানে প্রান্তিক জীবনের নিদারুণ সংগ্রাম ও তার মধ্যে থাকা মানবিক মূল্যবোধের এক অসাধারণ দ্যুতি পাঠকের মনের মধ্যে অশ্রুসিক্ত অনুভূতির দীর্ঘকালীন রেশ ছড়িয়ে রেখে যায়।

প্রথমেই বিশ্লেষণ করা যাক কাহিনীর পটভূমিকা যার আখ্যান রাঢ় অঞ্চলের নিম্নবিত্ত প্রান্তিক মানুষ হারাই-এর জীবনের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে। হারাইকে কেন্দ্র করে গল্পটি তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। আর এই তিনটি পর্যায়ে একটি মানুষের সামগ্রিক জীবন সংগ্রামের নিদারুণ দিক যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি তার মনস্তত্ত্বের উন্মোচন ও সার্থকতার সাথে উঠে এসেছে। প্রথমে হারাই-এর পরিচয় পর্ব সেখানে মৃত ভাই দোলাই-এর দেওয়া কথা রাখতেই চারু মাস্টারের বাড়ি সে কলাই ডাল ও কুমড়ো দিতে এসেছে। বদলে পেয়েছে সুন্দর শাহুদানা চাল যা তাদের মতো মানুষদের কাছে স্বপ্ন। এই ধানের জন্য দু-রাতের পথে গো-যানে আসা যাওয়া।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে হারাই-এর বাঁওয়ালী বলদ ধনার অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে। সেখানে ঝাড়ফুঁক ও গ্রামীণ পদ্ধতিতে মন্ত্রপূত জল এইসব অযৌক্তিক রীতি পালনের মাধ্যমে গরুকে সুস্থ করে তোলার প্রচেষ্টায়। ধনার শরীর ক্রমেই খারাপ হয়েছে। শেষে পথের মাঝখানে না থেকে মেদীপুর চটিতে যাওয়ার প্রস্তুতি ও নিজের কাঁধে ধনার জোয়াল নিয়ে জীবন্ত জানোয়ারে পরিণত হয়েছে সে।

তৃতীয় পর্যায়ে গল্পের মূল Climax ধরা পড়েছে, অসুস্থ ধনাকে হালালের জন্য দিলজান রাস্তা থেকেই রাতের বেলা কিনে নিতে চাইলেও হারাই বিশ্বাস করেনি ধনা মারা যাবে। নিজের কষ্টকে গুরুত্ব না দিয়ে হারাই অসুস্থ ধনাকে নিয়ে মেদীপুর চটিতে পৌঁছেছে। সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনায় নিজের সন্তানের প্রাণের বিনিময়েও ধনার প্রাণ

ভিক্ষা চেয়েছে সে। কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে ধীরে ধীরে মৃত প্রায় হয়ে পড়েছে গোরুটি। আবার দিলজান এসেছে, এবারে আর তাকে খালি হাতে ফিরতে হয়নি। হারাই-এর হাতে তিরিশ টাকা দিয়ে ধনাকে নিয়ে গেছে হালালের জন্য।

কিন্তু কাহিনীর এই অংশটিই শেষ নয়, সন্তানতুল্য ধনাকে হারিয়ে যে যন্ত্রণার সূচনা হল তা আরও বড় আকার নিল বদর হাজির দাওয়াতে দিলজানের থেকে সংগ্রহ করে আনা হালালের গোস্তের মাংস—যা আসলে তার ধনারই শরীরের অংশ। এই যন্ত্রণা হারাইকে প্রকৃতই এক অসহায় সর্বরিক্ত মানুষে পরিণত করেছে। কাহিনীর শেষ অংশের এই অপ্রত্যাশিত চমকের জন্যই আখ্যানটি পাঠকের মনে বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। আর ছোটগল্পের যে মূল শর্ত সেটি গল্পের শেষে গল্পকার শৈল্পিক মর্যাদায় তুলে ধরেছেন, যা আখ্যানটিকে সার্থক ছোটগল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পরিণতির এই চমকের সাথে আছে গল্পটির ভাষা ও সংলাপ যা মূল আখ্যানের বিষয়টিকে আরও ঘনীভূত করতে সাহায্য করেছে। হারাই প্রান্তিক মানুষ নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত তার সংলাপে উঠে এসেছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি—চারু মাস্টারের মেয়ে যখন তাকে বলে— ''চাচা, লজ্জা কোরো না, পেট পুরে খাও।'' তখন হারাই পরম পরিতৃপ্তির সাথে বলে—''খাছি মা, খুব খাছি। বড় মিঠা আপনারঘেরাঢ় দেশের ভাত।'' আবার সানকিডাঙার গো বদ্যি পিরিমল হাড়ি যে গাছের শিকড় বাকড় দিয়ে অসুস্থ গরুর চিকিৎসা করে সে হারাই-এর অর্জুন গাছের নীচে গাড়ি রাখার জন্য আঁতকে উঠে বলে—

''হুই দেখছিস একটা শুকনো ছাল ছাড়া ডাল। দেখতে পাছিস?
ভয়ে ভয়ে দেখে নিয়ে হারাই বলে- হুঁ।
- কালুদিয়াড় চিনিস কুথা?
- সেতো ভৈরব নদীর পাড় ভগরথপুরের ধারে।
ইসমিল ইভেনে গাড়ি রেখে কী করেছিল জানিস?
- না বদ্যি মশাই
- আত্মহত্যে।'' —এই কথোপকথনে ধরা পড়েছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাংলার উপভাষার ব্যবহার এবং সর্বোপরি নিম্নবিত্ত মানুষের মুখের ব্যবহৃত ভাষা যা ঐ নির্দিষ্ট পেশার মানুষদের জীবনকে প্রতিফলিত করেছে। প্রতিটি চরিত্রের মুখের ভাষা আলাদা হওয়ায় একই জায়গায় অবস্থান করেও পেশাগত ভিন্নতার দিকটি সংলাপে প্রতিফলিত হয়েছে। আর বাস্তবের মাটি থেকে নেওয়া উপাদান নিয়ে গল্পটির পটভূমিকা ও চরিত্রের রূপায়ণ হয়েছে বলে গল্পের মূল বিষয়ের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ধরা পড়েছে। ফলে ছোটগল্পের একমুখীন গতিকে বজায় রাখতে চরিত্রদের যথাযথ উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিনের রোজনামচা থেকে জীবনের কিছু কিছু মুহূর্তকে তুলে ধরার জন্য ছোটগল্পকারের নিজস্ব ভাবনা কৌশল ছোটগল্পের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। 'গোঘ্ন'

08/09/2023 10:18

গল্পটির মধ্যে লেখক সেই বিশেষ দিকগুলিকে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে বিশেষ সার্থকতা লাভ করেছে।

৫

'গোঘ্ন' গল্পের মূল ও প্রধান চরিত্র হারুণ আলি ওরফে হারাই। গল্পটির মূল বুনিয়াদ এই চরিত্রটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে। হারাইএর জীবনের মানবিক মূল্যবোধের এক অসাধারণ মুহূর্তকে অসীম মমতায় ফ্রেমবন্দী করেছেন লেখক। 'গোঘ্ন'-র আক্ষরিক অর্থের সীমানা ভেঙে এক বিস্তৃত ব্যাপক অনুভবের ব্যঞ্জনায় তাকে মিশিয়ে দিতে পেরেছেন লেখক। গল্পের শেষের নাটকীয় মোড় এসেছে হারাই-এর জীবনের অসহনীয় এক দুঃখকে কেন্দ্র করে। গল্পের শুরু ও শেষ দুটোই হয়েছে হারাইকে দিয়ে এবং সমগ্র কাহিনীর অগ্রগতি ও নাটকীয় মোড় যা সফল ছোটগল্প হয়ে ওঠার অন্যতম দিক, তাও হারাই-এর জীবনে একদিন এক রাতের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

হারাই বেঘরাই অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষ, যে জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছে কঠোর সংগ্রাম করে। পড়াশুনা না জানা 'বেঘরাই গাড়োয়ান'দের তাই সম্মান খুব বেশি জোটে না। চারু মাস্টার অসুস্থ বলদকে বদ্যি দেখানোর কথায় হারাইকে বলে—"তোমরা বাখড়ে গাড়োয়ানরা বড় আলসে মাইরি।"

এই প্রসঙ্গ এসেছে হারাই-এর ভাই দোলাই-এর মৃত্যুর প্রসঙ্গে, আবার সানকিডাঙায় পিরিমল বদ্যি হারাইকে অর্জুনতলায় গাড়ি বাঁধতে দেখে বলেছে—"...এঃ হে হে হে... ওরে বাখড়ে ভূত!"

সব জায়গায় বাঘরাই স্থানটির সাথে হারাই-এর পরিচয় জড়িয়ে থাকে। নিজস্ব পরিচিতি নয়, গ্রামীণ সংস্কৃতিতে অঞ্চলভিত্তিক বৈশিষ্ট্যের বাহক হয় এই হারাই-এর মতন প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষেরা।

বাইরের সবার কাছে হারাই বেখরাই অঞ্চলের অজ্ঞ, মূর্খ, গ্রামীণ ভূত বলে পরিচিত হলেও তার অন্তরে বাস করে এক কর্তব্যপরায়ণ সত্তা, যে প্রকৃতই এক হৃদয়বান মানুষ। পরিবার পরিজনদের সাথে নিয়ে একসাথে বেঁচে থাকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে সে। বছরের বেশিরভাগ সময় ভাত খেতে পারে না তারা। নদীর পলিমাটি সমৃদ্ধ রাঢ় অংশে সুন্দর শাহুদানা চাল-এর প্রত্যাশায় গো-যান করে তার নিজের হাতে তৈরি 'খণ্ড ফলমূল সবজি' নিয়ে বিনিময় করতে আসে। সে 'মুসাফির' নয়। তার আত্মসম্মান ভিক্ষা করতে দেয় না বরং বিনিময়ের মাধ্যমে ধান নিয়ে যায় তার পরিবারের সকল সদস্যদের জন্য। ধানের সাথে খড়ও পায়, যা তার পালিত বলদ দুটির জীবনধারণে কাজে লাগে।

হারাই কর্তব্যকর্মে নিষ্ঠাবান। তাইতো মৃত ভাই দোলাই এর দেওয়া কথা রাখতে অসময়ে মাঘ মাসের শেষে এসেছে চারু মাস্টারের বাড়ি। তার মেয়ের বিয়েতে কুমড়ো আর কলাই-এর ডাল দিতে। ভাই মারা গেলেও কথা রাখতে সে উপস্থিত হয়েছে দু-রাতের পথ অতিক্রম করে।

শুধু কর্তব্য পালনই নয়, হারাই ব্যক্তিগত জীবনেও সৎ ও ধর্মনিষ্ঠ সরল মানুষ। ''হারাই পান খায় না। বিড়ি, তামাক খায় না। সন্ধ্যায় মসজিদে গিয়ে ধর্মকথা শোনে।''

ধর্মপালনে নিষ্ঠাবান হারাই সাথে টুপি রাখে। নামাজের সময় রাস্তায় বসেই তার প্রার্থনা চলে। কিন্তু এই ধর্মীয় আচার পালন হারাই মন থেকে ভালোবেসে করলেও সে কিন্তু গোঁড়া নয়, ধর্মীয় আচার জীবনের প্রয়োজনের থেকে তার কাছে বড় নয়। তাই ভাই দোলাই যখন প্রথম প্রথম তার সাথে রাঢ় দেশে চারু মাস্টারের বাড়িতে আসতো তখন হিন্দু গ্রামে হিন্দু বাড়িতে ভাত খাওয়ার কথা সে ভাবতে পারতো না। দাদা হারাইকে বলতো—''হেঁদুর বাড়ি খাবা? ও বড়ভাই, হেঁদুর বাড়ি খাবা?...''

হারাই কিন্তু আচারসর্বস্ব মানুষ নয়, সে বাস্তববোধ সম্পন্ন একজন মানুষ। তাই ভাইকে বলেছিলো— ''জান বাঁচানো ফরজ কাম, জানিস গে ছোঁকড়া?''

অর্থাৎ আগে মানুষের জীবন তারপরে ধর্ম পালন। এই বিজ্ঞ ও উদার দৃষ্টি প্রকৃত শিক্ষাকেই তুলে ধরে। হারাই জীবনের এই মূল্যবান শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পেরেছিল তার অন্তরের ঔদার্যের কারণে। আর তার অন্তরের তলদেশে ছড়িয়ে থাকা মানসিক চেতনা তাকে আরও বেশি মহনীয় করে তুলেছে যখন তার পোষা বলদ ধনা ও মনাকে সে সন্তানের মতো বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। সানকিডাঙা থেকে মেদীপুর চটি দুক্রোশ পথ অসুস্থ বলদ ধনা গাড়ি টানতে পারবে না সেটা অনুভব করে হারাই। ছোটবেলা থেকে সে তার স্ত্রী ধনা, মনাকে যত্ন করে পালন করেছে। নির্জন রাস্তায় দুটি পোষা বলদ গরুকে সঙ্গে নিয়ে মনে করেছে সেই কথা— ''বুঝিরে বুঝি। সেই ছুটো থেকে মাগ মরদে পেলেছি, তু হামারসে বেটা। হামারসে কলিমদ্দি, ছলিমদ্দি, আসিরদ্দি যেমন বেটা তোরা ধনা মনাও হামারসে দুই ব্যাটা ওঠ বাপ।''

নিজের ঔরসজাত সন্তানদের সাথে দুটি পালিত পশু একইভাবে হারাই-এর হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। তাই তাকে ভারমুক্ত করে নিজের কাঁধে বলদের জোয়াল উঠিয়ে নেয়। কারণ সুস্থভাবে ধনা, মনাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাড়ি থেকে আসার সময় অজানা অচেনা রাস্তায় এদের দুজনের হাতে নিজের স্বামীকে তুলে দেয় হারাই-এর বিবি। তিনজনে বাড়ি ফিরলে পরিবারে আবার পুনর্মিলন উৎসব হবে। অভাব ও কষ্টের সময়ে নানা সমস্যা কাটিয়ে হারাই মনে প্রাণে আনন্দিত হয়ে উঠবে। সেই কথা মনে করে রাস্তায় এগোতে থাকে নিঃস্তব্ধ শীতের রাতে। মনের মধ্যে জন্ম নেয় কত কথা। নিজে গো-যানে জুড়ে উপলব্ধি করে গো জন্ম নেওয়ার কি কষ্ট। মানুষ হয়েও আজ সে জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। ''দুঃখে হেসে ওঠে হারাই। শ্বাসপ্রশ্বাস মিশিয়ে হাসে। ... হাসছিস না বেটা? জান ভরে হাস, তবে কথা কী, ভেবে দেখলে দুনিয়ার অনেক মানুষও তোদের মতন অবোলা জানোয়ার বইকি।''

এক গ্রাম্য অশিক্ষিত খেটে খাওয়া মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতায় সব থেকে মূল্যবান উপলব্ধি এখানে ধরা পড়েছে। হারাই বুঝতে পারে মানুষও আসলে বৃহত্তর এক জানোয়ারই—হয়তো দেখা যায় না কিন্তু কোন এক অদৃশ্য মনিবের অঙ্গুলিহেলনে মানুষ

নানা কর্তব্যের বোঝা পিঠে বয়ে নিয়ে চলে। তাইতো সে বলদ মনাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠে— "...ভেবে দেখলে দুনিয়ার অনেক মানুষও তোদের মতন অবোলা জানোয়ার বইকি। ঠাউর করে দেখবি, তাদেরখে পিঠে ওজনদার ছালা চাপানো আছে ধনা।"

এই নিদারুণ উপলব্ধি প্রকৃতই এক দার্শনিক মননের পরিচয় দেয়। জীবনের দুঃখের বোঝা টানতে টানতে ক্রমশ মানুষ এক জন্ম থেকে আরেক জন্মের দিকে অগ্রসর হতে হতে চারু মাস্টারের বাজানো বেহালার সুরের কারুণ্য যেন হারাই-এর সমগ্র অস্তিত্বে ঝংকার তুলতে থাকে। তার মনে হয় এই গো-যান টানতে টানতেই বোধহয় সে মারা যাবে। পথ আর শেষ হবে না।

তবুও জীবন চলে, পথে দিলজান কসাই আসে অসুস্থ ধনাকে সস্তায় কিনে নিতে চায় হালাল করার জন্য। ধনার সমস্ত অন্তরাত্মা চিৎকার করে 'না' বলে। ধনাকে সে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। সে মারা যাবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে দ্রুত সে মেদীপুর চটির দিকে যাত্রা করে। চটিতে হিমের রাতে অসহায় হারাই ভোরের নামাজে বসে তার আল্লার কাছে অশ্রুজলে প্রার্থনা করে— "হামার বেটার জান মাঙি হুজুর আর কিছু মাঙি না সংসারে... তুমি এক ব্যাটার জানের বদলে হামারসে আরেক ব্যাটার হায়াত দাও।"

নিজের সন্তানের প্রাণের সাথে তার বলদ গরুটির জীবন বিনিময় করতে চায় ধনা। একা অসহায় অপরিচিত স্থানে অসুস্থ সন্তানসম ধনার প্রাণ সে সর্বশক্তিমানের কাছে ফেরত চায়। অর্থবল, লোকবল কোনো কিছুই তার নেই—আছে কেবল সর্বশক্তিমানের ওপর অগাধ আস্থা। নিজের অন্তরে এই পালন করা দুটি বলদ গরু শুধু তার কাজের সহযোগীই নয়, তার ভালোবাসা ও আদরের সন্তানও বটে। তাই তার অসহায়তার কথা সে আর কাউকে বোঝাতে পারে না। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে শেষ পর্যন্ত হার মানে হারাই। বাজারে সবার কথায় উঠে আসে ধনার অসুস্থতার প্রসঙ্গ। কেউ আশা দেখাতে পারে না। সেই গতরাতের দিলজান এবার তিরিশ টাকার বিনিময়ে ধনাকে হালালের জন্য নিয়ে যায়। মূক বধির হয়ে টাকা কটা নিয়ে বসে থাকে হারাই।

সন্তান সারিয়ে ঘরে ফেরার পালা হারাই-এর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাঁধে জোয়াল টেনে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে। তখনই ভট্টমাটির বদর হাজির আমন্ত্রণ পায় হারাই। দুঃখের মধ্যেও হারাই আমির বড়ালোকের সাথে একাসনে দাওয়াত খেতে বসলো। "জীবনের সব দুঃখ, বঞ্চনা, হারানোর শোক ক্ষোভ আর ধনার মৃত্যুর কথা সে ভুলে গেল।"

সেই মুহূর্তে কিছু সুখের স্পর্শ তাকে ঘিরে ধরলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কিছু দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে যায় হারাই-এর কাছে। হাজীর ভাগ্নে বেটা মেদীপুর থেকে আজই হালাল করা গো-মাংস এনেছে তাই দিয়ে সে অতিথি সৎকার করছে।

হারাই মাংস ফেলে দেয়—বুকফাটা কান্নায় সে বলতে থাকে "... হামাকে হারাম খাওয়ালেন। ... হামাকে হামারই বেটার গোসতো খাওয়ালেন, হেই হাজিসাব! হামার ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে গেল গা, এক পদ্মার পানিতেও এই আগুন নিভবে না গো।"

উপস্থিত কেউ হারাই-এর কষ্টের কারণ বোঝে না। সন্তানসম ধনার স্মৃতি তাকে অসহায় করে তোলে। বুকফাটা কান্নায় ধুয়ে ফেলতে চায় মনের আগুন কিন্তু সে যে নেভার নয়।

সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে—সাথে নিয়ে যাচ্ছে চারু মাস্টারের বেহালার করুণ সুর, কিছু ধান। দূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে— "নক্ষত্রভরা আকাশের ঈশান কোণে এক ছবি। দূরের গাঁয়ে পাটকাঠির বেড়ার ধারে লম্ফ হাতে দাঁড়িয়ে আছে কলিমদ্দিরের মা। হারাইয়ের বহু। তার পায়ের কাছে মাটির বদনায় পদ্মার জল। ধনা-মনার পা ধুয়ে দেবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।"

ধনার বাবা বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু ধনাকে আর সে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। এক অসহায় পিতার মর্মস্পর্শী যন্ত্রণার ছবি দিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। শুধু রয়ে গেছে হারাই-এর হৃদয়ের অতলান্ত শূন্যতা যা চারু মাস্টারের বেহালার সুরের কারুণ্যের মতই সকরুণ ও হৃদয়স্পর্শী।

'গোম্ন' গল্পটি একটি তাৎপর্যধর্মী ছোটগল্প। গল্পের মূল সুরটি ট্র্যাজেডির। গল্প শেষ হয়েছে এক অতলান্ত বিষাদের আবহে, যা পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে তোলে। কাহিনীর একমুখীন গতি, সাবলীল বর্ণনা ও গল্প উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে শিল্পিত ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত ভাষার ব্যবহার' বিশেষভাবে হারাই-এর মুখে ব্যবহৃত শব্দ নিঃসন্দেহে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও রীতিনীতিকে তুলে ধরেছে। পলি সমৃদ্ধ ভাগীরথী নদীর পারে জন্মায় যে স্বাদু শাহুদানা ধান তার টানে বেখরাইয়ের মতন অনুর্বর মাটিতে বসবাসকারী হারাইদের মতন প্রান্তিক নিম্নবিত্ত মানুষেরা ছুটে যায়। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় নানা অজানা অনিশ্চিত আশঙ্কাকে বুকে চেপে ধরে। সেই অসামান্য সংগ্রামের জীবনের গল্প হারাই-এর মাধ্যমে লেখক অসামান্য ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেছেন। গল্পটি একজন অসহায় মানুষের সন্তান বিয়োগের যন্ত্রণার গল্প, যে সন্তান মানুষ নয়। একটি জানোয়ারের রূপে এসেছে। কিন্তু বলদ গরুটি এখানে হারাই-এর নিজের সন্তানের মতোই আদরণীয়। তাই একটি মানুষের বাৎসল্য রসের মানবিক উজ্জ্বলতা তুলে ধরে গল্পটি অসাধারণ এক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। স্বার্থপরতার অমানিশা নয় বরং মানবিকতার উজ্জ্বলতায় একটি অশিক্ষিত, মূর্খ মানুষ অনেক বেশি সম্মানের অধিকারী হয়েছে। হারাইকে সেই সম্মান দানে লেখক যেমন কুণ্ঠিত হননি পাঠকও তাকে আন্তরিক ভালোবাসায় গ্রহণ করেছে। তাই 'গোম্ন' গল্পটি এক ভিন্নধর্মী মানবিক উজ্জ্বলতার গল্প যেটি শেষ হয়েও পাঠকের হৃদয়ে রেশ রেখে যায় আনন্দ ও বেদনা দুইয়েরই।